সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮১ পঞ্চাশ পয়সা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

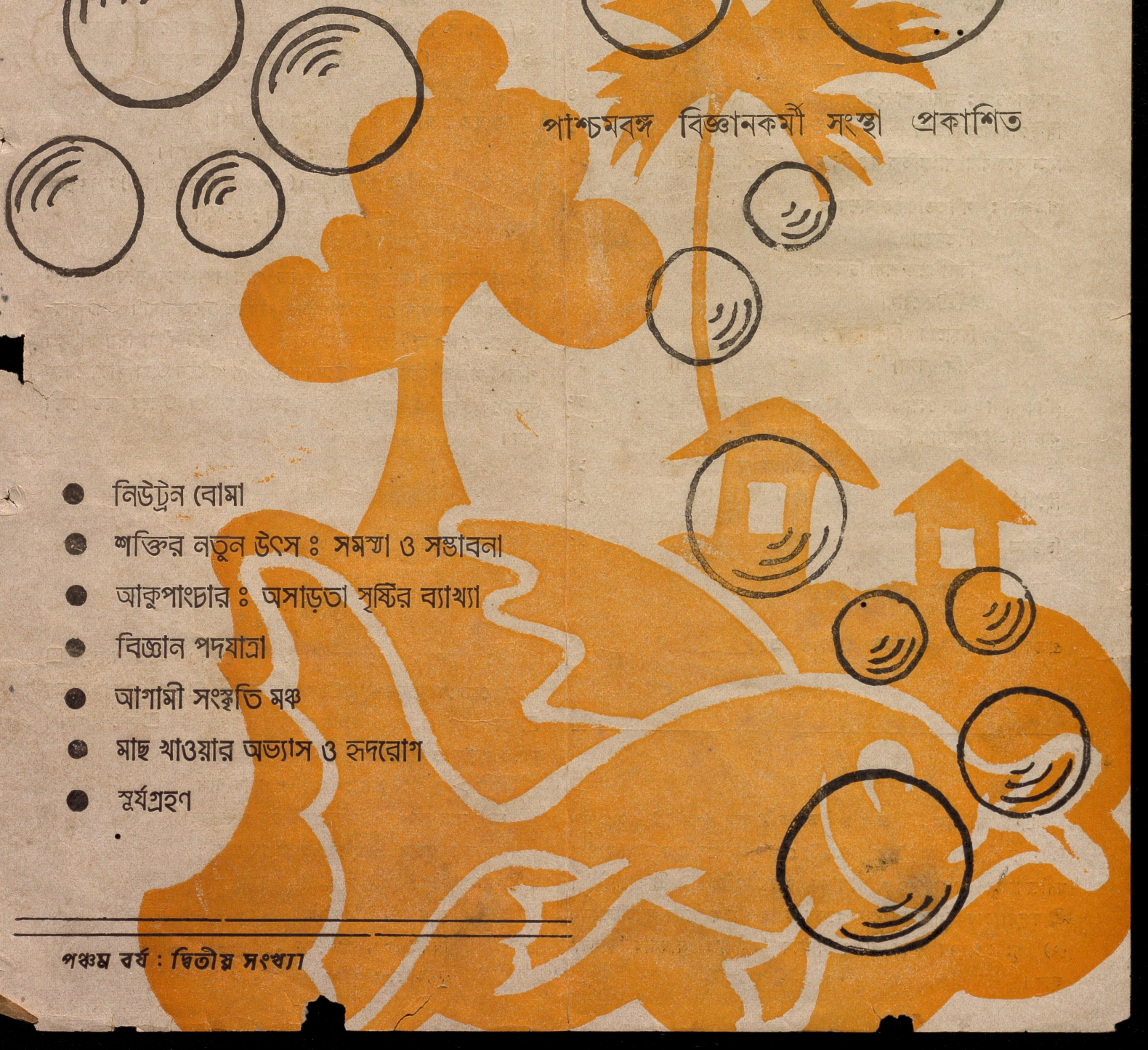

- নিউট্রন বোমা
- শক্তির নতুন উৎস ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা
- আকুপাংচার ঃ অসাড়তা সৃষ্টির ব্যাখ্যা
- বিজ্ঞান পদযাত্রা
- আগামী সংস্কৃতি মঞ্চ
- মাছ খাওয়ার অভ্যাস ও হৃদরোগ
- সূর্যগ্রহণ

পঞ্চম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—১৯৮১

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচী

সম্পাদকীয়। নিউট্রন বোমা ১

পত্রিকা সম্পর্কে পাঠক ১

নূতন এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি : সমস্যা ও সম্ভাবনা
—হিরন্ময় সাহা ২

আকুপাংচার : অসাড়তা সৃষ্টির ব্যাখ্যা —অভিজিৎ লাহিড়ী ৬

মিছিলের পথে বিজ্ঞান —নিজস্ব প্রতিনিধি ৯

বিজ্ঞানকে যারা সাংস্কৃতিক মঞ্চ দিচ্ছে —সৌমেন গুহ ১০

পরিক্রমা : সাঁওতালদির অন্ধকার
শিশুহত্যা
বিনা রক্তে শল্য চিকিৎসা
নিউট্রন বোমা
বিহারের খনিপ্রাচুর্যে লুণ্ঠন
খনি দুর্ঘটনা সন্ধানী ১২

শাঁখ বাজাও রাহু খেদাও —রবীন চক্রবর্তী ১৩

মাছ খাওয়ার অভ্যাস কি হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায় ?
—গৌতম ব্যানার্জী ১৪

রিপোর্ট ১৬

চিঠিপত্র ১৭

প্রচ্ছদপট তৈরী করেছেন সৌমেন গুহ।

ত্রুটি স্বীকার ('বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' জুলাই-আগস্ট ১৯৮১)। (১) হোমিওপ্যাথির উপর নিবন্ধটির লেখক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছে মনীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও দীপাঞ্জন রায়চৌধুরীর। শ্রী রায়চৌধুরী শ্রী মজুমদারের মূল প্রবন্ধটিকে সংক্ষেপ করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। (২) পৃঃ ১৫, ২য় কলম, পঞ্চম লাইনে 'মালদা'র জায়গায় 'ঝালদা' হবে।

লেখা চাই। বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানকর্মীদের সমস্যা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রচনা সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে আহ্বান করা হচ্ছে। কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হরফে অনধিক ২০০০ শব্দের মধ্যে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের লেখা পেতে আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখকের নাম ও ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্যই থাকা চাই। এই ঠিকানায় পাঠান : ১, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

যোগাযোগের ঠিকানা। (১) c/o ডি. এস. এন্টারপ্রাইজ, ৫২/৯/সি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ (প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়) (২) ১, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ (প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়)

গ্রাহক চাঁদা (সডাক) বার্ষিক তিন টাকা।
প্রাতিষ্ঠানিক : বার্ষিক পাঁচ টাকা।
স্টলের কমিশন (১০ কপি বা ততোধিক) : ২৫%
এজেন্টদের কমিশন : ৩৩%।

আবেদন। গ্রাকহদের নিয়মিত পত্রিকা পাঠানো সত্ত্বেও অনেকে অভিযোগ করছেন যে তাঁরা পত্রিকা ঠিকমত পাচ্ছেন না। এটি ডাক-বিভাগের কোন ত্রুটি কিনা আমরা জানি না। তবে যাঁরা নিজ দায়িত্বে পত্রিকা অফিস থেকে সংগ্রহ করে নিতে রাজী আছেন তাঁরা আগে থেকে জানালে তাঁদের কপিগুলি আমরা ডাকে না পাঠিয়ে তাঁদের জন্য রেখে দেব।

উৎস মানুষ

বিশেষ যুগ্মসংখ্যা বেরোচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষে। এতে থাকছে ☐ মানুষ যেভাবে মানুষ হ'ল ☐ আগুন সন্ন্যাসী ☐ কালী মায়ের নগ্নরূপ ☐ ধর্মীয় মেলায় একটি বিজ্ঞান অনুষ্ঠান (মহারাষ্ট্রে) ☐ সাপের মাথার মণি॥ এছাড়াও থাকছে—

চাষী > কৃষি > খনন > খনা → খনার বচন

মন + সম্মোহন = > বিচিত্র শারীরিক প্রতিক্রিয়া

দিল্লীর লৌহস্তম্ভ ± মরচে = রহস্য কোথায়

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১২ টাকা। যোগাযোগ—

সম্পাদক, উৎসমানুষ
বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক
কলকাতা-৭০০০৬৪।

সম্পাদকীয়। নিউট্রন বোমা ঃ বোতলের দৈত্য ফুঁসছে।

বছর ঘুরে আবার এল ৬ই আগস্ট। গত বছর এই দিনটিতে হিরোসিমা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞানকর্মীদের তরফ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল আজকের দিনে পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে।* এক বছর যেতে না যেতেই আরো বহুগুণ তীব্র হয়ে উঠেছে এই উদ্বেগ। রিগানের নেতৃত্বে মার্কিন সরকার পাইকারি হারে নিউট্রন বোমা তৈরী আর মজুতের কাজে নেমে পড়েছে। উন্মাদের মত যুদ্ধের জিগির তুলে চ'লেছে রিগান আর হেগ। রক্ত-জমা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপে। আর সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে……।

'ন্যাটো' আর 'ওয়ারশ' চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সীমান্ত জুড়ে মোতায়েন রয়েছে বিপুল সংখ্যক সোভিয়েত ট্যাঙ্ক। সেগুলি ইউরোপে ঢুকে পড়লে তাদের ধ্বংস করার জন্যই নাকি নিউট্রন বোমা। রুশ আগ্রাসী সামরিকীকরণের অবিশ্বাস্য মাত্রা কারুর অজানা নয়। কিন্তু রুশ ট্যাঙ্ক ধ্বংসের যে অজুহাত আমেরিকা দিয়েছে তার চাইতে হাস্যকর ছেলে ভুলানো যুক্তি কিছু হ'তে পারে কিনা জানা নেই। ইউরোপের 'ন্যাটো' ভুক্ত দেশগুলিতে যে পরিমাণ ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী উপকরণ মজুত আছে তাতে সমস্ত সোভিয়েত ট্যাঙ্ক একবার কেন, দু'বারও ধ্বংস করা যায়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নিউট্রন বোমা তৈরীর মূল উদ্দেশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে এটিকে আক্রমণের একটি যুতসই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। আমেরিকার সিদ্ধান্তে পারমাণবিক অস্ত্রের দৌড় এক বিপজ্জনক বাঁক নিল। রুশ বিবৃতিগুলি থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে যে রাশিয়াও অচিরেই নিউট্রন বোমা মজুত করা শুরু করবে। ইউরোপের মানুষ, এমনকি সেখানকার শাসক শ্রেণীগুলিও আজ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। ইউরোপকে মাঝে রেখে দুই বৃহৎশক্তি শান দিয়ে চ'লেছে পারমাণবিক অস্ত্রগুলিতে। পারমাণবিক যুদ্ধের ধকল সামলাতে হ'বে ইউরোপকেই একথা ভালভাবে জেনেও সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় আমেরিকা আজ এক ধাক্কায় পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিপজ্জনকভাবে কাছে এনে ফেলল।

এর শেষ কোথায়? সময়-বোমার টিক্ টিক্ শব্দ কি আমাদের অভিভূত করবে আতঙ্কগ্রস্ত নিষ্ক্রিয়তায়, না সক্রিয় করে তুলবে সব রকমের সমরবাদকে চিরতরে ধ্বংস করার অভিযানে?

এদেশের উলেখযোগ্য খবর, সারা উত্তর ভারত জুড়ে আবার ভয়বহ বন্যা। পশ্চিম বাংলায় এখনো (আগষ্টের শেষে পর্যন্ত) বন্যা দেখা দেয় নি, তবে বন্যার আগেকার অনেকগুলি লক্ষণ আশঙ্কজনকভাবে প্রকট হ'য়ে উঠছে।

তবে ভয় নেই, 'অ্যাপ্‌ল' আকাশে উঠেছে। 'অ্যাপ্‌ল' এর পথ বেয়ে উঠবে নতুন নতুন আরো কৃত্রিম উপগ্রহ। বন্যার ভয় থেকে তখন আমাদের মুক্তি……।

*'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সেপ্টে ঃ- অক্টো ঃ ১৯৮০ ও নভে ঃ- ডিসে ঃ ১৯৮০ দ্রষ্টব্য।

পত্রিকা সম্পর্কে পাঠক

['বি-ও-বি'র সব পাঠকের কাছ থেকে চাইছি পত্রিকা সম্পর্কে মতামত। পত্রিকা কতটা উপযোগিতা অর্জন ক'রেছে, এর দিশায় কোন পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা, তা বুঝতে পারব এইসব মতামত থেকে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হ'ল আরো কয়েকটি মত। সঃ মঃ, 'বি-ও-বি'।]

সুনীল মুখার্জী (গবেষক-কর্মী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ঃ

মোটামুটি নিয়মিত পড়ি। প্রবন্ধ ও রিপোর্ট দুই দিকেই বিজ্ঞান-কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রয়োজনের তুলনায় কম গুরুত্ব পাচ্ছে। বিষয়-বৈচিত্র্য বাড়ানোর ও ছোট ছোট লেখা প্রকাশের সিদ্ধান্ত ভাল, তবে বিশদ বিশ্লেষণ সম্বলিত লেখাও মাঝে মাঝে থাকা দরকার। বিশেষত বিজ্ঞান-নীতি, বিজ্ঞান ও কুসংস্কার, বিজ্ঞান-আন্দোলন, এগুলির উপর।

তারাশঙ্কর নাগ (গবেষক কর্মী, সাহা ইনস্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স)

বি-ও-বি মাঝে মাঝে পাই ও পড়ি; পত্রিকার জন্য খুব যে একটা আগ্রহ বোধ আছে এমন নয়। কিছু কিছু লেখা ভালই লাগে তবে বিশেষ করে ছাপ ফেলেছে এমন কোন লেখার কথা মনে আসছে না। বিজ্ঞানের কিছু কিছু তথ্য পত্রিকায় জায়গা পেলে ভালই হয়। বাংলা প্রবন্ধগুলির সারমর্ম একটু বিশদে ইংরাজিতে দিলে ভাল হয়।

রঞ্জন রায় (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলিকাতা)।

পত্রিকাটি আমার ভাল লাগে। এর কোন পরিবর্তন না করাই ভাল। (জুন. ১৯৮১)

নূতন এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি ঃ সম্ভাবনা ও সমস্যা

বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক শক্তি সঙ্কট।

আজকাল খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের সঙ্কটের সাথে সাথে আরও একটা সঙ্কটের কথা খুব বেশী করে শোনা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে শক্তির সঙ্কট। একদিকে কয়লা, কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রলের অভাব, অন্যদিকে সারাবছর ধরেই দিনে রাতে লোডশেডিং-এর প্রাচুর্য, শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে শক্তি সঙ্কটের চেহারাটা ভালভাবেই প্রকাশিত করেছে। সাধারণভাবে তাই শক্তিসঙ্কট বলতে শহরাঞ্চলে কয়লা, কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রল, গ্যাস এবং বিদ্যুতের অভাব বোঝায়। শক্তির এই সমস্ত উৎসকে বাণিজ্যিক শক্তি (**Commercial energy**) বলা হয় তাই এটাকে প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক শক্তির সঙ্কট বলা যেতে পারে। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এটাকে প্রধানতঃ 'তৈলসংকট' হিসেবে বলা হচ্ছে। কোন দেশের উন্নতির অন্যতম পরিমাপ হচ্ছে বাণিজ্যিক শক্তির ব্যবহার। আমেরিকা ইওরোপের দেশগুলোতে বাণিজ্যিক শক্তি গড়ে মাথাপিছু বার্ষিক 4000 থেকে 5000 কিলোওয়াট-ঘণ্টা ব্যবহার হয়— যেখানে ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশগুলোতে লাগে গড়ে মাথাপিছু বার্ষিক মাত্র 50-100 কিলোওয়াট-ঘণ্টা। এই যৎসামান্য বাণিজ্যিক শক্তির যোগান দিতেও আমাদের দেশে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে তা সত্যিই লজ্জা এবং দুঃখের ব্যাপার।

অন্যদিকে, আমাদের দেশে এবং অনুরূপ দেশগুলোতে মোট ব্যবহৃত শক্তির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে অবাণিজ্যিক শক্তি (**non-commercial sources of energy**)। অবাণিজ্যিক শক্তির উৎস বলতে জ্বালানি কাঠ, ঘুঁটে, শস্যাবশেষ, মানুষ এবং পশুর শ্রমশক্তি ইত্যাদি বোঝায়। আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বলে মনে হলেও, ভারতে অবাণিজ্যিক শক্তির অংশ হচ্ছে শতকরা প্রায় 40-60 ভাগ, বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, তানজানিয়াতে শতকরা প্রায় 80-৫8 ভাগ। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে আমাদের মত দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য মানুষ প্রধানত এই অবাণিজ্যিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক শক্তি সঙ্কটের অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে এই অবাণিজ্যিক শক্তির সঙ্কট। এটাকে গ্রামীণ শক্তির সঙ্কট বা জ্বালানির সঙ্কট হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়।

গ্রামীণ শক্তির ব্যবহার

গ্রামীণ শক্তি সঙ্কটের গুরুত্ব বুঝতে হলে গ্রামাঞ্চলে শক্তির ব্যবহারের চরিত্র বুঝতে হবে। দক্ষিণ ভারতের একটি ছোট গ্রামে (লোকসংখ্যা 357) শক্তির ব্যবহারের চিত্রটি 1 নং সারণীতে দেখানো হোল।

1 নং সারণী

($x10^6$ কিলোক্যালরি / বছর)

	চাষবাস	ঘরকন্না	আলো	শিল্প	মোট
মানুষ—	7·97	50·78	—	4·97	63·72
(পুরুষ)—	4·98	20·59	—	4·12	29·69
(মহিলা)—	2·99	22·79	—	0·85	26·63
(শিশু)—	—	7·40	—	—	7·40
গবাদি পশু	12·40	—	—	—	12·40
জ্বালানি কাঠ	—	789·66	—	33·93	823·59
কেরোসিন	—	—	17·40	1·40	18·80
বিদ্যুৎ—	6·25	—	2·65	0·71	9·61
মোট—	26·62	840·44	20·05	41·01	928·12

মোট শক্তি = 928×10^6 কিলোক্যালরি / বছর

= $1{\cdot}08 \times 10^6$ কিলোওয়াট-ঘণ্টা / বছর।

[উৎস—**Rural Technology, ed. A. K. N. Reddy, Indian Academy of Sciences, 1980, p 112**]

সারণীটি থেকে নীচের সিদ্ধান্তগুলোতে আসা যেতে পারে—

(ক) কেরোসিন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রচলিত বাণিজ্যিক শক্তি ঐ গ্রামটির মোট শক্তির চাহিদার মাত্র 3% যেটায়। বাকী 97% আসে জ্বালানি কাঠ (89%), মানুষের শ্রমশক্তি (7%) এলং পশুর শ্রমশক্তি (1%) থেকে।

(খ) প্রকৃতপক্ষে গ্রামটির প্রায় সমস্ত শক্তির উৎসই হচ্ছে প্রচলিত অবাণিজ্যিক শক্তি। যেমন—কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আসে

প্রধানত মানুষ এবং পশুর শ্রমশক্তি থেকে, রান্নাবান্নার শক্তি আসে জ্বালানির কাঠ থেকে।

(গ) শক্তির উৎসের এই আদিম প্রকৃতি কৃষির উৎপাদনশীলতাকে বাড়তে দিচ্ছে না; মানুষের শ্রমশক্তির একটা বিরাট অংশ অপব্যয়িত হচ্ছে জ্বালানিকাঠ সংগ্রহে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, গড়ে প্রায় প্রতিদিন ঘরপিছু 2·6 ঘণ্টায় 4·8 Km পথ ঘুরে 10 kg কাঠ সংগ্রহ করতে হয়।

যত দিন যাচ্ছে, লোকসংখ্যা বাড়ছে, গ্রামের চারিদিকের বনজঙ্গল ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। জমির উৎপাদনশীলতা না বাড়ার ফলে মাথা-পিছু কাঠের পরিমাণ কমছে, রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের অভাব ক্রমশঃই তীব্র হয়ে উঠছে।

নবীকরণযোগ্য শক্তি

গ্রামীণ শক্তিসঙ্কটের একটি লক্ষ্যণীয় দিক হচ্ছে যে প্রচলিত বাণিজ্যিক শক্তি গ্রামীণ শক্তির চাহিদা মেটায় না। ডিজেল, কেরোসিন, কয়লা ক্রমশই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। কাজেই গ্রামীণ শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য এদের ব্যবহার আরও কমবে বই বাড়বে না। গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের সাফল্য সম্পর্কেও ক্রমশই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশে এক হাজারেরও কম জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামগুলোর মধ্যে (শতকরা 55 ভাগ ভারতবাসীই এই রকম গ্রামের বাসিন্দা) মাত্র 20% গ্রামে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ গেছে। এই সব গ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার অন্যতম প্রধান বাধা হচ্ছে যে এখানে লোড ফ্যাক্টর (ব্যবহারের মাত্রা) অত্যন্ত কম; যার ফলে তার টেনে নিয়ে যাওয়ার খরচ পোষায় না। তাছাড়া একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রথমত গ্রামীণ বিদ্যুতের মূল সুবিধাভোগী হচ্ছে গ্রামের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণী এবং দ্বিতীয়ত, লোডশেডিং, তারচুরি এবং নানারকম যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য যে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ আছে সেখানেও বৈদ্যুতিক পাম্পের চাইতে ডিজেল পাম্পের চাহিদাই বেশী।

গ্রামীণ শক্তিসমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্যে তাই আজ প্রচলিত বাণিজ্যিক শক্তির বিকল্প হিসেবে নূতন এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির (new and renewable sources of energy) কথা খুব শোনা যাচ্ছে।

নূতন এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি বলতে কি বোঝায়? সম্প্রতি 10–21 আগস্ট নাইরোবিতে নবীকরণযোগ্য শক্তির ওপর যে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে, তাতে এর সংজ্ঞা হিসেবে—সৌর, ভূতাপীয়, বায়ু, জোয়ার-ভাঁটা, সমুদ্রের ঢেউ, সামুদ্রিক তাপ, জৈববস্তুর রূপান্তর, জ্বালানি-কাঠ, কাঠকয়লা, শস্যাবশেষ, গবাদি পশু, কয়লাজাত তেল (Oil shale), আলকাতরা (tar sand) এবং জলবিদ্যুৎ—এই চোদ্দটি শক্তির উৎসকে ধরা হয়েছে। এই চোদ্দটির মধ্যে সবগুলি সব জায়গায় পাওয়া যায় না এবং গ্রামীণ শক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্যও নয়। এদের মধ্যে সৌর, বায়ু, জৈববস্তুর রূপান্তর, জ্বালানি কাঠ, গবাদি পশু এবং জলবিদ্যুৎ এই সাতটি নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত শক্তির যথাযথ ব্যবহার দ্বারা গ্রামীণ শক্তির মোট চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটান যায়।

জৈববস্তুর রূপান্তর

গবাদি পশুর এবং মানুষের মল, পচা পাতা, আলু, শাকসব্জি এবং শস্যাবশেষ ইত্যাদি নানারকম বর্জ্য জৈববস্তুর বায়ুনিরুদ্ধ পচনের সাহায্যে যে গ্যাস পাওয়া যায় তার মধ্যে শতকরা 60 ভাগ মিথেন গ্যাস থাকে। এই গ্যাসের সাহায্যে রান্না করা, আলো জ্বালানো এমন কি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। গ্যাস উৎপাদনের পর যে তলানি পড়ে থাকে, সার হিসেবে তার মূল্য খুব বেশী। হিসেব করে দেখা গেছে যে, পরিবার পিছু দিনে তিনবার রান্না করতে গ্যাস লাগে প্রতিদিনে প্রায় 11·4 ঘনমিটার। তিন থেকে চারটে গরুর গোবর এতে লাগে। আলোর জন্য যে পরিমাণ গ্যাস লাগে একটি বা দুটি গরুর গোবর তা জোগাতে পারে। কাজেই রান্না এবং আলোর জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস পেতে হলে পরিবার পিছু পাঁচটি বা ছয়টি গরুর প্রয়োজন। তাছাড়া একটি পারিবারিক গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের (1 ঘন মিটার) দাম কম করেও প্রায় 2000/- টাকা। গ্রামাঞ্চলে একমাত্র মুষ্টিমেয় ধনী চাষীদের পক্ষেই এটা সম্ভব। কাজেই আমাদের দেশে খাদি গ্রামোদ্যোগ এবং সরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গত 20 বছরে যে মাত্র 40,000 গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী হয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে এটি।

গোবর গ্যাসের বহুল ব্যবহারের ব্যাপারে পৃথিবীর মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশী এগিয়ে গেছে চীন। একটি সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ যে আগামী পাঁচ বছরে চীনে 2 কোটী জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট চালু হবে। চীনের এই সাফল্যের কারণ দুটি। প্রথমত তারা গোবর গ্যাসের পরিবর্তে জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহার করে। অর্থাৎ এতে শুধু গোবর না দিয়ে মানুষসহ যে কোন প্রাণীরই মল, পচা আলু, কলা, শস্যাবশেষ, কচুরিপানা, ঘাস ইত্যাদি সবরকম বর্জ্য জৈববস্তু ব্যবহার করা হয়, ফলে বিশুদ্ধ গোবরের প্রয়োজন অনেক কমে যায়। দ্বিতীয়তঃ চীনে জৈবগ্যাস প্রধানতঃ সমবায়িক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়। এমনকি ছোট ছোট পারিবারিক জৈবগ্যাস-প্ল্যান্ট গুলোও সমবায় থেকেই বসানো ও চালানো হয়।

জৈবগ্যাস প্ল্যান্টের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে সমবায়িক বা গ্রামীণ জৈব গ্যাস প্ল্যান্টের মাথাপিছু খরচ পারিবারিক প্ল্যান্টের তুলনায় অনেক কম। 500 জনের রান্না এবং আলোর জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তির

চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট বসাতে এবং নিয়মিত চালানোর জন্য মাথাপিছু প্রাথমিক খরচা 150 টাকা এবং বার্ষিক খরচা 50 টাকা মতো লাগবে। সমবায়িক বা সরকারী উদ্যোগের পক্ষে এই পরিমাণ প্রাথমিক অর্থব্যয় অসম্ভব নয়। এর ফলে গ্রামীণ শক্তি, ফসলের সার, পরিবেশ এবং আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ে যে পরিমাণ সুবিধে পাওয়া যাবে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৈবগ্যাসের সম্ভাবনা ও সমস্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে দুটো প্রধান সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। প্রথমত, জৈবগ্যাসের ব্যবহার গ্রামীণ শক্তি সমস্যা সমাধানে কারিগরী এবং অর্থনৈতিক উভয় দিকেই বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক ভিত্তির বদলে সমবায়িক ভিত্তিতেই জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট অনেক বেশী কার্যকরী। অন্যথায় গ্রামীণ বিদ্যুতের মত জৈবগ্যাস প্ল্যান্টও গ্রামের মাত্র শতকরা 10 ভাগ লোকের ভোগে আসবে এবং গ্রামাঞ্চলের শক্তি-সমস্যা সমাধানে বিশেষ কোন কাজে আসবে না।

সৌর শক্তি

প্রত্যক্ষ সৌরশক্তির সাহায্যে গ্রামীণ শক্তির চাহিদা মেটানো কি সম্ভব? নিরক্ষরেখার $\pm 40^{\circ}$ অক্ষরেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রতি বর্গমিটারে গড়ে প্রায় দৈনিক 6 কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি বছরে প্রায় 300 দিন পাওয়া যায়। এই অপর্যাপ্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি পরিবারের রান্না, গরমজল ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির সংস্থান সহজেই হতে পারে। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে রান্নার জন্যই সবচেয়ে বেশী শক্তির প্রয়োজন (শতকরা 70 ভাগের বেশী) হয়, এবং গ্রামাঞ্চলে রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের অভাব ক্রমশই তীব্র হচ্ছে, সৌরচুল্লীর (solar cooker) ব্যবহার তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া সৌরশক্তির একটা মস্তবড় সুবিধে হচ্ছে যে এতে যা খরচ তার সবটাই প্রায় এককালীন। দৈনন্দিন জ্বালানি বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ লাগে না বললেই চলে। কিন্তু একটি পরিবারের উপযুক্ত সৌরচুল্লীর খরচ প্রায় 300 টাকা মত পড়ে। তাছাড়া সৌরচুল্লীতে রান্না ঘরের মধ্যে করা যায় না। তাপকে ইচ্ছামত কমান বাড়ানো যায় না। এবং সৌরচুল্লী প্রচলিত চুল্লীর তুলনায় আয়তন এবং ওজনেও বড় হয়। এই সমস্ত কারণে সৌরচুল্লী 1954 এ আমাদের দেশে প্রথম তৈরী হলেও আজ পর্যন্ত খুব একটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। তবে সম্প্রতি গুজরাট অঞ্চলে এর ব্যবহার সুরু হয়েছে।

সৌরচুল্লী ছাড়াও জল গরমের জন্য, ফসল-সংরক্ষণ ও শুকানোর জন্য সৌরশক্তির ব্যবহার সম্ভব। 20 ঘনফুট ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি সাধারণ সৌর জলশোষকের (solar drier) দাম প্রায় 400 টাকা মত পড়ে। লক্ষ্যনীয় যে জৈব গ্যাসপ্ল্যান্টের মত সৌরচুল্লী বা সৌর জলশোষক সমবায়িক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হলে অর্থনৈতিক ভাবে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হয়।

চীন ঃ সৌর শক্তির ব্যাপক ব্যবহার

চীনের প্রায় ৭০ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে সৌরশক্তির সাহায্যে চালিত হিটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর ফলে চীনে বছরে ২০,০৮০ টন কয়লা জমছে।

"চাইনা ডেলীর" এক বিবৃতির সূত্রে প্রকাশ, মহাকাশ অভিযান, নৌ ও রেলওয়ে পরিবহণের ক্ষেত্রেও সৌর কোষের ব্যবহার পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া অনুর্বরা কৃষি জমিগুলিতে ফসল উৎপাদনের কাজেও সৌরশক্তি কতটা উপযোগী তা নিয়ে জোর গবেষণা চলছে। সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীনের দৈনন্দিন জীবনে সৌর-শক্তির সাহায্যে চালিত প্রায় ২,১০০টি স্টোভ ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া কয়েকটি শহরের স্কুল, অফিস ও হাসপাতালেও সৌরশক্তি চালিত হিটার বসানো হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, আলো বিকীরণের মাধ্যমে সূর্য পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি যোগান দিয়ে থাকে সারা বছর অন্যান্য উৎসগুলি থেকে অর্জিত শক্তির চেয়ে তা ২০,০০০ গুণ বেশি।

গত পাঁচ বছরে সৌরশক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে চীন অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে। বিজ্ঞানীরা তথ্য উদ্ভাবন করছেন এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলি সূর্যকিরণ ধরে রাখার জন্য নিত্যনূতন উচ্চমানের দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করছেন।

আজকাল ২২।৮।৮১

সৌরশক্তির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাব্য ব্যবহার হতে পারে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। সৌরকোষের (solar cell) সাহায্যে সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করা যায় এবং সেই বিদ্যুত দিয়ে আলো জ্বালান থেকে চাষের জন্য পাম্প চালানো সবই সম্ভব। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, এক কিলোওয়াট সৌরকোষের দাম যদি 20,000/- টাকার মধ্যেও নামিয়ে আনা যায় (বর্তমান দাম প্রায়, 100,000/- টাকা) তবে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় 5 হর্স পাওয়ারের ডিজেল পাম্পের চাইতে তা অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হবে। সৌর বিদ্যুতের আর একটি হিসেবে দেখা যায় যে একটি গ্রামের সমস্ত পরিবার যদি আলাদাভাবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার করে তাহলে যে খরচ হয়, সমস্ত গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ একটি মাত্র সমবায়িক সৌর-কেন্দ্রে উৎপন্ন করে ঘরে ঘরে বণ্টন করার খরচ তার পাঁচ ভাগের একভাগ।

জ্বালানী কাঠ

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে জ্বালানী কাঠ (89%)। কিন্তু যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য বনজঙ্গল দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত

হচ্ছে। ফলে কেবলমাত্র জ্বালানি কাঠের যে অভাব হচ্ছে তা নয়, পরিবেশগত ভাবে প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেমন বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে, মাটি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, নদীনালাপুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি। এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হতে পারে বৃক্ষরোপন, বিশেষত জ্বালানিকাঠের বৃক্ষরোপন। যে হারে জ্বালানিকাঠের ব্যবহার হয়, তার সমান বা বেশী হারে বৃক্ষ উৎপাদন প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন প্রতি বছরে প্রতি হেক্টরে 25-60 ঘনমিটার বৃক্ষ উৎপাদন। বৃক্ষরোপন এবং পরিণত বৃক্ষছেদনের মধ্যে 4-8 বছরের বেশী ফারাক হলে চলবে না। হিসেব করে দেখা গেছে যে, জমির ভাড়া যদি একর প্রতি 450 টাকা হয়, এবং দৈনিক 16 টা শ্রমিক পিছু দিতে হয়, তবে এইভাবে উৎপন্ন জ্বালানিকাঠের দাম পড়ে প্রতি ঘনমিটারে 30-80 টাকা 1 টাকা রান্না ইত্যাদির জন্য গড়ে মাথাপিছু বছরে 1 ঘনমিটার কাঠ লাগে। কাজেই মাথাপিছু বছরে জ্বালানিকাঠের জন্য খরচ পড়ে 30-80 টাকা। এই পরিমাণ জ্বালানি কাঠ তৈরী করতে মাথাপিছু জমি লাগবে 1·5—2·7 বিঘা অর্থাৎ 500 জনের গ্রামে জ্বালানিকাঠের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ জমি বা পতিত বনভূমি সবসময়ে সব অঞ্চলে নাও পাওয়া যেতে পারে। তবে জ্বালানিকাঠের সমস্যার কিছুটা সমাধান এইভাবে উচ্চ উৎপাদনশীল বৃক্ষরোপন করে করা সম্ভব এবং পরিবেশগত ভাবে কাম্য।

সমস্যা

গ্রামাঞ্চলে শক্তির সঙ্কট মেটানোর উপায় হিসেবে নবীকরণযোগ্য শক্তির যে বিপুল সম্ভাবনা আছে তা অনস্বীকার্য। এই নবীকরণযোগ্য শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতাও কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন জৈব বস্তুর রূপান্তর ও বৃক্ষজ সম্পদের ক্ষেত্রে, এখনই বর্তমান। কিন্তু নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারের প্রধান বাধা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে কি জৈববস্তুর রূপান্তর, কি সৌরশক্তি, কি বৃক্ষজ সম্পদ, সবকিছুই অর্থনৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে যদি এর ব্যবহার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক না হয়ে সমবায়িক হয়। যে কারণে চীনে নবীকরণযোগ্য-শক্তির ব্যবহার আমাদের দেশের তুলনায় দেরীতে শুরু হয়েও অনেক দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় সমবায়িক চেতনা গড়ে না ওঠায় নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার কাগজে কলমে এবং বক্তৃতাতেই বেশীর ভাগ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ইত্যাদি নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারের জন্য আরও বেশী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণার প্রয়োজন। এই গবেষণা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় গবেষণাগারের মধ্যে সীমিত রাখলে চলবে না। গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য উপযোগী করে

শক্তি সমস্যা ঃ কারিগরী নয়, সামাজিক

তৃতীয় বিশ্বের শহর এবং গ্রামে শক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণ আলাদা। ঘন বসতির জন্য এ সব দেশের শহরাঞ্চলে শক্তির ব্যবহারের প্রকৃতি অনেকটা উন্নত দেশের মতোই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শক্তির ব্যবহার ভীষণভাবে কম। জ্বালানি কাঠ এবং শস্যাবশেষই তৃতীয় বিশ্বের অর্ধেক লোককে তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি যোগায়। শক্তি সম্পর্কে আরেকটি উদ্বেগজনক ব্যাপার হচ্ছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব এবং জনবহুল দেশগুলোতে শক্তিসমস্যা এবং খাদ্যসমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।..... উন্নতিশীল দেশগুলোর পক্ষে শক্তির সমস্যা সমাধান না করে খাদ্যসমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।.....এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর ভূমিকা প্রযুক্তিগত দক্ষতার চাইতেও সামাজিক প্রগতির জন্য অনুসৃত নীতির ওপরে বেশী নির্ভরশীল। উন্নতিশীল দেশগুলির কাছে কোন্ কোন্ এবং কি পরিমাণ নূতন শক্তির উৎস ব্যবহার করা হবে তার চাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে কি ধরনের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হবে। সামাজিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মূল প্রশ্নগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শক্তির উৎস বেছে নিতে হবে।

এ থেকে বোঝা যায় যে শক্তিসঙ্কটের বিভিন্ন দিকগুলোর মধ্যে যে দিকটি সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে—শক্তির মানবিক দিক। শেষ পর্যন্ত কোন্ শক্তির উৎস সমাজ এবং মানুষ গ্রহণ করবে তা কিন্তু সরকার বা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্ধারিত হবে না। জনগণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে লেবেল লাগানো খাপে মোড়া শক্তির প্যাকেট জনগণের কোনও কাজে লাগবে না যদি তা সামাজিকভাবে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়। কাজেই শক্তির বিভিন্ন উৎসগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে তা প্রধানত রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা—প্রযুক্তিগত নয়। বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদদের কাজ হচ্ছে যতগুলো সম্ভব শক্তির উৎসকে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় নিয়ে আসা যাতে প্রয়োজনমত সেগুলো কাজে লাগান যায়।

—Soedjatmoke, (Rector, the United Nations University) United Nations conference on New and Renewable sources of Energy, Nairobi, 10—21 August, 1981.

তুলতে হলে দক্ষ গ্রামীণ কারিগরের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। গ্রামের দক্ষ কামার, কুমোর, ছুতোর এদের সাহায্য ছাড়া গ্রামের প্রয়োজনীয় উপযোগী এবং গ্রামের মানুষের সাধ্যায়ত্ত যন্ত্র গড়ে তোলা খুবই মুস্কিল। তাছাড়া নবীকরণযোগ্য শক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি কোন একটি মাত্র উৎসের উপর নির্ভরশীল নয়। জৈববস্তু, সৌর, জ্বালানিবৃক্ষ, বায়ু ইত্যাদি অনেকগুলো উৎসের থেকে শক্তি উৎপাদন এবং সুষম বণ্টন—এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এই ধরনের ব্যবস্থা চালানো খুবই মুস্কিল।

তৃতীয়ত, নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রধান ব্যবহার হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। শহরাঞ্চলে এবং বৃহৎ শিল্পোদ্যোগে যে বাণিজ্যিক শক্তির ব্যবহার হয়, নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস থেকে প্রত্যক্ষভাবে তার যোগান পাওয়া আপাতত দুষ্কর। তাছাড়া, পারমাণবিক শক্তির মত যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষার কাজে শক্তির এই সমস্ত নেহাত 'গ্রাম্য' উৎসকে লাগানোর সম্ভাবনা খুবই কম। আমাদের দেশের পরিকল্পনায় তাই বাণিজ্যিক শক্তির ওপরেই খুব জোর দেওয়া হয়। শক্তির গবেষণা ক্ষেত্রেও কয়লা, তৈলবীজ, পারমাণবিক শক্তির ওপরেই অনেকবেশী বাজেট ধরা হয়।

তাই রাজনৈতিক কারণে গ্রামীণ উন্নয়নের নামে নবীকরণযোগ্য শক্তি বলে যতই ঢক্কানিনাদ হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের শক্তির উৎসের ওপর মৌলিক গবেষণাকে তুলনা-মূলকভাবে খুবই কম গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের মত দেশে তাই নবীকরণযোগ্য শক্তির বিশাল সম্ভাবনা সত্ত্বেও এগুলির ব্যবহার বাস্তবায়িত যে কবে হবে তা বলা শক্ত।

হিরন্ময় সাহা। কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়

আকুপাংচার ঃ অসাড়তা সৃষ্টির ব্যাখ্যা

একটি উল্লেখযোগ্য নজীর আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা। আগে অনেকেই অবিশ্বাস করতেন। বলতেন গাঁজাখুরি। কিন্তু এখন সে মনোভাব অনেকটা পালটাচ্ছে। আকুপাংচার ক্লিনিকগুলিতে এখন বেশ ভীড় হয়। হাঁপানি, সায়াটিকা, বাত, প্যারালিসিস এইসব রোগ নিয়ে দূর দূর থেকেও লোকে আসেন চিকিৎসা করাতে। ভাল হন অনেকেই। তবে এখনো কিন্তু আকুপাংচার 'বৈজ্ঞানিক' চিকিৎসাপদ্ধতির স্বীকৃতি পেয়ে জাতে ওঠে নি। প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের বেশীর ভাগই একে তাচ্ছিল্য করেন। কবিরাজের পাঁচন, চাঁদসীর ক্ষত চিকিৎসা, হোমিও-প্যাথির 'হাই পোটেন্সী' ওষুধ 'আকুপাংচার' সবই এঁদের কাছে হাতুড়ে ব্যাপার। কারণ কি? না, এদের পিছনে কোন 'থিওরী' নেই। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে, এই চিকিৎসাপদ্ধতিগুলির শরণাপন্ন যাঁরা হন তাঁদের অধিকাংশই গরীব লোক। তাই, অন্তত আমাদের দেশে, এগুলির সত্যিকারের বৈজ্ঞানিকীকরণের কোন চেষ্টা উপর মহল থেকে নেই। আর সবচেয়ে গণ্ডগোল বেধেছে এই পদ্ধতি-গুলি যাঁরা প্রয়োগ করেন তাঁদের নিয়ে। নিজের নিজের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ ক'রে সবগুলিকে একটা সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত করার বিশেষ চেষ্টা এঁদের নেই। ফলে, এগুলির ভিতর যে অংশটি গ্রহণযোগ্য তা মিশে থাকছে একগাদা অর্থহীন, উদ্ভট, অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর প্রয়োগপ্রক্রিয়ার সঙ্গে। আর বড় বড় ডাক্তার-বাবুদের সুবিধা হচ্ছে এগুলিকে অবজ্ঞা করে চৌষট্টি টাকা ভিজিট হাঁকড়াবার। আকুপাংচারের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি বিশেষ দুঃখজনক, কারণ আমাদের দেশে, বিশেষত পশ্চিমবাংলায়, গতকয়েক বছরে আকুপাং-চারের প্রবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা। বহু সামাজিক চেতনাসম্পন্ন তরুণ-তরুণী এতে ট্রেনিং নিয়ে গরীব মানুষের চিকিৎসার কাজে নেমেছেন। কিন্তু আকুপাংচারকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড় করানোর বা এ নিয়ে গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর মনোভাব বেশ বিরল। যেটুকু আছে তা অনেকটা আলগা ধরনের, আর প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। তাই, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাহসের সঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণ করার ব্যাপারে পশ্চিমবাংলা পৃথিবীতে নজীর স্থাপন করলেও, এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু আবার আমাদেরকে হাত পেতে নিতে হচ্ছে ভিন্ দেশের প্রসাদ।

আকুপাংচারে অসাড়তা সৃষ্টি ঃ কয়েকটি গোড়ার কথা।

আকুপাংচারে রোগ সারে কিনা, সারলেও কোন কোন রোগ সারে আর কোনগুলির কেবল সাময়িক উপশম হয় সে বিষয়ে ভিন্ন জন ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত গোঁড়া আর পণ্ডিতমূর্খ কিছু

লোক ছাড়া প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে সূচ ফুটিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ করার ব্যাপারটি সত্যিই সম্ভব, এর মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। আকুপাংচার এনাস্থেশিয়াতে আজকাল বহু জায়গায় বহু অপারেশন হচ্ছে। এটিই আকুপাংচারের সবচাইতে বেশী প্রচারিত ও পরিচিত দিক। সূচ ফুটিয়ে অসাড়তা সৃষ্টি সম্ভব হয় কিভাবে, সে বিষয়ে বিদেশে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। জানা গেছে অনেক কিছুই, যদিও অনেকটাই এখনো অজানা। যতটুকু জানা গেছে তাতে স্নায়বিক উত্তেজনাগুলির পারস্পরিক বিক্রিয়ার তত্ত্বটিই মোটামুটিভাবে সমর্থিত হ'চ্ছে।

সনাতনী বিধান অনুসারে শরীরে আকুপাংচারের প্রায় ৩৬০টি নির্দিষ্ট বিন্দু আছে। বিন্দুগুলি ১২টি দ্রাঘিমারেখার উপর অবস্থিত। বলা হয়, দ্রাঘিমা রেখাগুলি নিয়ে যে জটিল বর্তনী বা সার্কিট গঠিত তার মধ্যে দিয়ে দুই বিপরীত ধরণের 'প্রাণশক্তি' প্রবাহিত হয়। কোন কারণে এদের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হলে রোগের সৃষ্টি হয়। জায়গামত সূচ ফুটিয়ে আবার প্রবাহের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনলে রোগ সারে।

আপাতদৃষ্টিতে 'দ্বান্দ্বিক' মনে হলেও 'প্রাণশক্তি'র তত্ত্বটি ভিত্তিহীন। সূচ ফোটালে আসলে যা হয় তা হ'ল, নির্দিষ্ট স্নায়ুপথ বেয়ে বৈদ্যুতিক উত্তেজনার প্রবাহ সৃষ্টি। অবশ্য স্নায়ু ছাড়াও, পেশী ও শরীরের বিভিন্ন তরলের মধ্যে দিয়েও বৈদ্যুতিক প্রবাহ বইতে পারে, তবে এগুলির বিষয়ে ভালমত কিছু জানা নেই বলে আপাতত একে আলোচনার বাইরে রাখা যেতে পারে।

ঠিক কোন স্নায়ুপথে কি ধরনের বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রবাহিত হয় তা নির্ভর করে সূচ ফোটানোর জায়গা ও গভীরতার উপর। এক এক জায়গায় সূচ ফোটালে রোগীর এক এক ধরনের অনুভূতি হয়। আকুপাংচার পরিভাষায় এই অনুভূতিকে বলা হয় 'তেহ্-চি'। সূচ ফোটানোর সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁর আঙুলে যে অনুভূতি পান তাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অনুভূতির প্রকারভেদে স্নায়বিক উত্তেজনার ধরনও বিভিন্ন হয়।

অবশ করার জন্য যে সব বিন্দুতে সূচ ঢোকানো হয় সেগুলিতে একটা টান-টান ভাবের (distension) অনুভূতি হয়। এই অনুভূতির উৎস কোথায় ? প্রমাণ করা গেছে যে, যেখানে সূচ ফোটানো হচ্ছে সেখানকার গভীরে অবস্থিত পেশীকলার (deep tissue) সংকোচন ও এই সংকোচন থেকে উদ্ভূত প্রতিক্ষেপ ক্রিয়া (reflex action)-ই মূলত ঐ অনুভূতির উৎস। পেশীর বিভিন্ন ভাঁজ, স্নায়ুপ্রান্ত, ও রক্তনলিকাগুলির গায়ে অবস্থিত বহুসংখ্যক গ্রাহকযন্ত্রে (receptors) প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। তারপর বিভিন্ন গ্রাহকযন্ত্র থেকে একীভূত হ'য়ে কোন একটি মূল স্নায়ুসূত্র বেয়ে উত্তেজনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্যতম অংশ সুষুম্নাকাণ্ডের দিকে এগোয়। 'তেহ্-চি'-সঞ্জাত এই উত্তেজনাই অসাড়তা সৃষ্টির জন্য দায়ী। এর প্রমাণ, সূচের প্রয়োগবিন্দুর তলাকার গভীরের পেশীকলায় প্রোকেন জাতীয় ওষুধ দিয়ে স্থানীয় অসাড়তা সৃষ্টি করলে রোগী যেমন সূচ প্রয়োগের দরুন কোন অনুভূতি বোধ করে না, তেমনই আবার সূচ প্রয়োগের ফলে শরীরের অন্য যে জায়গাটিতে অসাড়তা সৃষ্টি হওয়ার কথা সেখানে অসাড়তাও সৃষ্টি হয় না।

অসাড়তা সৃষ্টির জন্য দায়ী এই উত্তেজনাপ্রবাহ কোন ধরনের স্নায়ুপথ বেয়ে এগোয় ? দেখা গেছে, এগুলি প্রধানত মাঝারি আকৃতির স্নায়ুসূত্র বরাবর প্রবাহিত হয়। আকৃতির বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক, কারণ বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি বিভিন্ন আকৃতির স্নায়ুসূত্র বেয়ে চলাচল করে। বিশেষত, ব্যথা-বেদনার অনুভূতি জাগায়, এমন ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনাগুলি সাধারণত খুব সরু স্নায়ুসূত্র অবলম্বন ক'রে প্রবাহিত হয়।

স্নায়বিক উত্তেজনাগুলির পারস্পরিক বিক্রিয়া।

এখন, মনে করা যাক শরীরের 'ক' চিহ্নিত জায়গায় কোন কারণে বেদনাবোধ সৃষ্টি হচ্ছে ও তাকে প্রশমিত করার জন্য (অর্থাৎ 'ক' চিহ্নিত জায়গাকে অসাড় করে দেওয়ার জন্য) 'খ' চিহ্নিত জায়গায় সূচ ফোটানো হয়েছে। 'ক' থেকে সরু স্নায়ুসূত্র বেয়ে বেদনাবোধসঞ্জাত বৈদ্যুতিক উত্তেজনা আর 'খ' থেকে, মাঝারি বা মোটা স্নায়ুসূত্র বেয়ে 'তেহ্-চি' সঞ্জাত উত্তেজনা সুষুম্নাকাণ্ডের দিকে এগুবে। 'ক' আর 'খ' এর পারস্পরিক অবস্থানের উপর নির্ভর ক'রে এই দুই উত্তেজনার পারস্পরিক বিক্রিয়া দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে ঘটতে পারে। এগুলিকে আলাদা ভাবে আলোচনা করা যাক।

(১) 'ক' আর 'খ' যদি কাছাকাছি অবস্থিত হয় তবে উত্তেজনা দুটি পাশাপাশি অবস্থিত স্নায়ুসূত্র দিয়ে প্রবাহিত হবে ও কাছাকাছি অবস্থিত স্নায়ুগ্রন্থির মাধ্যমে সেগুলি সুষুম্নকাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হবে। এক্ষেত্রে মোটা স্নায়ুসূত্র বাহিত উত্তেজনাটি সরু স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে প্রশমিত করে। সরু সূত্র বাহিত উত্তেজনা স্নায়ুগ্রন্থি অতিক্রম করার আগেই এই প্রশমন ঘটে ও একে বলা হয় 'প্রি-সিনাপ্টিক ইনহিবিশন' (pre-synaptic inhibition)। ঠিক কিভাবে এই 'প্রি-সিনাপটিক ইনহিবিশন' ঘটে তা অবশ্য ভালমত জানা নেই, তবে সত্যিই যে এ ধরনের প্রশমন ঘটে থাকে তার স্বপক্ষে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ আছে। আকুপাংচারে অসাড়তা সৃষ্টি অন্তত কিছু ক্ষেত্রে এই প্রশমনের মাধ্যমেই হয়, এই অনুমানের পিছনে পরোক্ষ হলেও, সমর্থন জোরালো। শরীরের কোন অংশে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার দরুন উদ্ভূত ব্যথায় (causalgia) ঐ জায়গার বিশেষ বিশেষ মোটা আকৃতির প্রান্তিক স্নায়ুকে (peripheral nerve) সরাসরি উত্তেজিত ক'রে আশ্চর্য ভাল ফল পাওয়া গেছে। থাইরয়েড গ্রন্থির অস্ত্রোপচারে আকু-

পাংচার এনাসথেশিয়ার বিশেষ সফল প্রয়োগ হ'য়েছে। এক্ষেত্রে সূচ ফোটানো হয় গলার দু'পাশে, যেখানে গ্রীবাদেশীয় স্নায়ুজালির (cervical plexus) মাঝের অংশ অবস্থিত। গলার সম্মুখ দিক থেকে (অর্থাৎ যেখানে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে) আসা স্নায়ুগুলি এর মধ্যে দিয়ে যায়। এক্ষেত্রে খুব সম্ভব উপরোক্ত ধরনের বিক্রিয়াই অসাড়তা সৃষ্টির কারণ। অনেক সময় দেখা যায়, শরীরের উর্দ্ধাঙ্গগুলি অবশ করার জন্য হাতে, গলায় বা কানে, আর নিম্নাঙ্গ অবশ করার জন্য পায়ে সূচ ফোটানো হয়। এসব ক্ষেত্রেও সরু স্নায়ুসূত্রের প্রশমন ক্রিয়াই সম্ভবত অসাড়তা সৃষ্টির ব্যাখ্যা। (২) অনেক ক্ষেত্রে আবার সূচ ফোটানো হয় যে জায়গার তার থেকে দূরের কোন অঙ্গে অসাড়তা সৃষ্টি হয়। আকুপাংচারের 'প্রাচীনপন্থী'রাই সাধারণত অসাড়তা সৃষ্টির এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এখানে স্পষ্টতই স্নায়ুসূত্রের স্তরে উত্তেজনাগুলির পারস্পরিক বিক্রিয়া সম্ভব নয়, কারণ স্নায়ুসূত্রগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। তাহলে নিশ্চয় উত্তেজনাগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (অর্থাৎ সুষুম্নাকাণ্ডে ও মস্তিষ্কে) এসে পৌছনর পর বেদনাসঞ্জাত উত্তেজনাটির প্রশমন ঘটে। নানাভাবে এই অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন্ কোন্ অংশে এই প্রশমন ক্রিয়া ঘটে তারও বেশ কিছুটা হদিশ মিলেছে। শরীরের ভিতরকার কোন কোন স্নায়ুর (visceral nerve) উত্তেজনার ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পায়ের পিছন দিকে বৈদ্যুতিক আকুপাংচারের দ্বারা এই প্রতিক্রিয়া প্রশমিত হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের উর্দ্ধাংশটিকে আংশিক বিচ্ছিন্ন করলে এই প্রশমনক্রিয়া আর ঘটে না। আকুপাংচার থেকে উদ্ভূত উত্তেজনা সুষুম্নাকাণ্ড অতিক্রম ক'রে মস্তিষ্কের নিচের দিকে কোন জায়গার পৌ.ছ (সম্ভবত 'বালবিউলার রেটিকুলার ফর্মেশন'এর মাঝামাঝি স্তরে) বিপরীত মুখী এমন কোন উত্তেজনা প্রবাহ পাঠায় যা মূল উত্তেজনা ও তার দরুন সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াকে প্রশমিত করে। প্রমাণ করা গেছে, এই বিপরীতমুখী উত্তেজনাটি 'ডরসোল্যাটারাল ফিউনিকুলাস' বেয়ে নামে। 'তেহ্-চি' সঞ্জাত উত্তেজনা কিন্তু উপরে ওঠে 'আন্টেরিওল্যাটেরাল ফিউনিকুলাস' বেয়ে। সুষুম্নাকাণ্ড অতিক্রম ক'রে এটি মধ্যমস্তিষ্কের 'বালবিউলার রেটিকুলার ফর্মেশনের' মধ্যে দিয়ে আরো উপরে ওঠে। একটু আগেই ব'লেছি, এই স্তরে একদফা প্রশমন সংঘটিত হয়। এর পর থ্যালামাসে এসে ঘটে আর এক দফা প্রশমন। বেদনাসঞ্জাত উত্তেজনা (যেটিকে প্রশমিত হ'তে হবে) থ্যালামাসের 'প্যারাফেশিকুলার নিউক্লিয়াস' (পি-এফ-এন) ও 'সেন্ট্রোমিডিয়ান নিউক্লিয়াস' (সি-এম-এন)-এ সংশ্লেষিত হয়। দেখা গেছে, পি-এফ-এনএর বেদনাসঞ্জাত সক্রিয়তাকে শরীরের উপযুক্ত জায়গায় সূচ ফুটিয়ে, বালবিউলার রেটিকুলার ফর্মেশনকে উত্তেজিত ক'রে, অথবা সি-এম-এন এ সরাসরি বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে প্রশমিত করা যায়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে, সূচ ফুটিয়েই হোক, বা সি-এম-এন এ উত্তেজনা জাগিয়েই হোক, দুই ক্ষেত্রেই সেকেণ্ডে ৪ থেকে ৮ কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক কম্পনের সাহায্য নিলে প্রশমনের মাত্রা সব চেয়ে বেশী হয়।

এথেকে ধারনা করা যেতে পারে, অসাড়তা সৃষ্টির ব্যাপারে পি-এফ এন ও সি-এম-এন এর বিশেষ ভূমিকা আছে। পরিক্ষা ক'রে দেখা গেছে, আকুপাংচার এনাসথেশিয়ার সময় সি-এম- এন এর সক্রিয়তা বেড়ে যায়। তবে এই দুটি কেন্দ্রের পারস্পরিক ক্রিয়া যে সরাসরি ঘটে এমন মনে করার কারণ নেই। দেখা গেছে পি-এফ-এন এর উপর সি-এম-এন এর প্রশমন ক্রিয়া ঘটার জন্য ১০ থেকে ২০ মিলিসেকেণ্ড সময় প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ খুব সম্ভব এই প্রশমন ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের আরো বহুসংখ্যক উচ্চতর কেন্দ্রের ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে থ্যালামাসের রেটিকুলার নিউক্লিয়াস, কডেট নিউক্লিয়াস, পুটামেন ও সেরিব্রাল কর্টেক্স (মস্তিষ্কের উচ্চতম স্তর) এর ভূমিকা চিহ্নিত হ'য়েছে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অসাড়তা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। এটিকে কিছুটা বোঝা গেলেও আরো ভালভাবে বুঝতে হলে আরো প্রচুর গবেষণা, প্রয়োগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন।

আকুপাংচারের ফলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে এন্ডরফিন জাতীয় কিছু অসাড়তা সৃষ্টিকারী রাসায়নিক নিঃসৃত হয়। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধু এই ঘটনাকেই অসাড়তা সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে ভাবা ভুল হবে। বরং এটিকে একটি জটিল প্রক্রিয়ার একটি উপাদান হিসেবেই দেখা ভাল।

শেষের কথা। অগ্রসর সামাজিক চেতনাসম্পন্ন যে ব্যক্তিরা আকুপাংচার চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগের পথ বেছে নিয়েছেন, এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খোঁজার উদ্যোগ যদি তাঁরা না নেন, তবে কিন্তু অচিরেই দেখা যাবে 'অ্যালোপাথি'র মত আকুপাংচারও সমাজবিমুখ কিছু 'বিশেষজ্ঞের' খপ্পরে প'ড়ে ব্যবসার সামগ্রী হ'য়ে উঠেছে।

[এই নিবন্ধটি 'এনডেভার' পত্রিকায় (পারগামন প্রেস, অক্সফোর্ড; নিউ সিরিজ, খণ্ড ৪, সংখ্যা ৩, ১৯৮০) প্রকাশিত সিয়াং-তুঙ চাঙ এর 'নিউরোফিজিওলজিকাল ইনটারপ্রেটেশন অফ অকুপাংচার এনালজেসিয়া' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা। উৎসাহী পাঠককে এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করা হ'চ্ছে।]

অভিজিৎ লাহিড়ী। বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ

মিছিলের পথে বিজ্ঞান

গত ২রা আগস্ট ১৯৮১ তারিখটি ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ১২১তম জন্মদিন। কলকাতায় একটি বিজ্ঞান মিছিলের পথ-পরিক্রমার মাধ্যমে অভিনবভাবে পালিত হল দিনটি। এ বছরেরই ৮ই মার্চ, কলকাতা থেকে একটু দূরে, খড়গপুরে মূলতঃ আই. আই. টি'র ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজ্ঞান মিছিলের পদযাত্রা (বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী—মে-জুন ১৯৮১ দ্রঃ)। তার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসার আগেই আবার যে এ ধরনের উদ্যোগ দেখা গেল সেটা নিশ্চয়ই আশা ও আনন্দের কথা।

২রা আগস্টের মিছিলে যোগদানকারীদের মধ্যে কাছের ও দূরের অন্তত ১৬টি বিজ্ঞান ক্লাব ছাড়াও ৩।৪টি স্কুল ও কয়েকটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান ছিল ; এছাড়াও বেশ কিছু শিক্ষক, গবেষক ও বিজ্ঞান অনুরাগী এতে অংশ নেন। মিছিল শুরু হয় হাজরা রোড ও হরিশ মুখার্জী রোডের সংযোগস্থল থেকে, সকাল প্রায় সাড়ে নটায়। রং-বেরং এর শতাধিক পোষ্টার ছয় শতাধিক কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-বৃদ্ধের হস্ত-বাহিত হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় হরিশ মুখার্জি রোড পেরিয়ে রবীন্দ্র সদনের গা ঘেঁষে এসপ্ল্যানেড ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়ে কলেজ স্কোয়ারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তির পাদপীঠে। প্রায় সাড়ে এগারটায় মিছিল তার গন্তব্যে পৌছতে পৌছতে কলেবর বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়াল প্রায় আটশোর মত। রবিবারের প্রায় নির্জন চৌরঙ্গী এলাকাটুকু বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই দুপাশের বাড়ীগুলোয় অলিন্দে ও গবাক্ষে দেখা গেছে উৎসুক চোখ মুখের ভীড়।

উদ্যোক্তাদের (সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন) ঘোষণা অনুযায়ী এ মিছিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রসার ও পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার প্রতি নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ'। স্বভাবতই অধিকাংশ পোষ্টারের বক্তব্যই ছিল পরিবেশকে নির্মল রাখার আবেদনমূলক। তবে নানা সংস্কারবিরোধী বেশ কয়েকটি পোষ্টারও যেমন ছিল, তেমনি আর্ত ও প্রতিবন্ধীদের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণী পোষ্টারও কয়েকটি ছিল। এর মধ্যে 'বৈজ্ঞানিক মন যার, জাত বিচার নেই তার' 'হাঁচি টিকটিকি বাধা, যে মানে সে গাধা' 'আমরা সবাই প্রতিবন্ধী, কেউ দেহে কেউ মনে' ইত্যাদি কয়েকটি পোষ্টার মনে রাখার মত। এছাড়াও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পত্রপত্রিকা পড়ার ও বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদন এবং আলিপুর চিড়িয়াখানার মধ্যে হোটেল তৈরী বন্ধের দাবী জানানো পোষ্টারগুলি মিছিলের বৈচিত্র্য বাড়াতে সাহায্য করেছিল।—সামনের একটি গাড়ীতে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের নজর-কাড়া প্রকাণ্ড একটি ব্যানার ও পেছনের তিন চারটি গাড়ীর একটি থেকে মাইকে ঘোষণা মিছিলের পরিচয় দিয়ে চলেছিল। অন্য গাড়ীগুলির একটিতে ছিল আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের প্রতিকৃতি ও তাঁর কিছু বাণী এবং শো কেসে সাজানো কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নমুনা, অন্য একটিতে জগদীশচন্দ্র, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা ও সি. ভি. রমনের প্রতিকৃতি ও কয়েকটি বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকার (বাংলা) নমুনা-প্রদর্শনী এবং তৃতীয়টিতে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়-করানো ছোট্ট একটি টেলিস্কোপ—একটি ছোট্ট চলমান প্রদর্শনী।

সব মিলিয়ে বলতেই হয় এ এক নতুন ধরনের মিছিল। উৎসাহী অংশভাক্‌দের স্বতস্ফূর্ততায়, লেখা ও আঁকার নৈপুন্যে ও সরলতায় এর আবেদন অনস্বীকার্য।

কিন্তু বিজ্ঞান মিছিলকে কত যে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হবে, তা বোঝা যায় যখন দেখি 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধ্বনিতে মিছিলকে সচকিত করে 'কোন বিশ্বাসে বিশ্বাস করব না' ইত্যাদি লেখা পোষ্টারগুলির পাশ ঘেঁষে চলে যায় একদল তরুণ ও যুবক ; অথবা যখন দেখি পথের ধারের ভিখারী পরিবারের ইটের উনুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঝাপসা করে দেয় 'পুরণো টায়ার, পলিথিন খোলা বাতাসে পোড়াবেন না' 'ধোঁয়াহীন জ্বালানী ব্যবহার করুন' লেখাগুলিকে।

এ মিছিলের প্রতিটি অংশীদার নিশ্চয়ই চাইবেন যে বিজ্ঞান-মিছিল আরও বড়, আরও ব্যাপক হয়ে জনজীবনকে বৈজ্ঞানিক বোধ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের টেনে আনবে আরোপিত গণ্ডীর বাইরে এবং এদেশের সবচেয়ে অবহেলিত ও শোষিত মানুষটিরও বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত চাহিদা পূরণে বিজ্ঞান দেবে পথের নিশানা। আর, তাই, এই নতুন উদ্যোগের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখলে ভুল হবে, বরং এ থেকে নিতে হবে ভবিষ্যতের শিক্ষা।

প্রথমেই বলি, আর একটু যত্ন নিলে এরই মধ্যে মিছিলটি সার্থকতর হয়ে উঠতো। রবিবার এবং বর্ষাকাল বিবেচনায় মিছিলটি চৌরঙ্গী এলাকা পরিহার করে কোন জনবসতিপূর্ণ রাস্তা ধরে এগোতে পারত; উপযুক্ত কোন স্থানে আধঘণ্টার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করলে বাইরের কিছু মানুষ হয়তো গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারতেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পত্রপত্রিকার যে কটি নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে তা ছাড়াও অন্তত একডজন উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকার নামগুলিও জানানো

যেতে পারতো। পোষ্টারের বিষয়বস্তুতে পরিকল্পনার অভাব প্রকট—'বাস ও লরীর কালো ধোঁয়া ক্যানসার সৃষ্টিকারী', 'জনতার চাপে কলকাতা বিপর্যস্ত, চাই সমপরিমাণ খোলা জায়গার সংরক্ষণ' 'Save a stretch of green to rest your soul' ইত্যাদি বক্তব্যগুলি সঠিক পরিপ্রেক্ষিতসহ প্রচারিত না হ'লে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারে কতখানি সহায়ক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। . কয়েকটি স্কুলের অংশগ্রহণ অভিনন্দনযোগ্য কিন্তু কলেজের অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক। পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক বিজ্ঞান ক্লাব—দূরের গোবরডাঙ্গা, তাহেরপুর, চুঁচুড়া থেকে ক্লাব প্রতিনিধিরা এলেন অথচ ঘরের কাছের বনেদী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গরহাজির—ভাবতে যেন কেমন লাগে! পরিশেষ বলি, একই মিছিলে একই উদ্দেশ্যে একই দিনে যোগদান করার কথা থাকলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ নামে খবরের কাগজে অনুষ্ঠান সংবাদ প্রকাশ করলেন (স্টেটস্‌ম্যান—২ আগষ্ট) সে কি শুধুই ভুল? নাকি, প্রচারের মোহ আমাদের উদ্দেশ্যের উপরে স্থান পায় বলেই এমনটি ঘটে থাকে?

তবু বলব, এটি যাত্রারম্ভ, মিছিল চলুক, সাথে চলুক বিজ্ঞান, শহরে ছাড়িয়ে দূরে—মানুষের কাছে, পথ অনেক বাকী।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিজ্ঞানকে যারা সাংস্কৃতিক মঞ্চ দিচ্ছে

বেলেঘাটার এঁদো নর্দমা—খালের পাড় ধরে চাউল-পট্টি রোড। বাস-রাস্তা থেকে একটানা হেঁটে গেলে একটা জায়গা বিচিত্র লাগবে একঘেয়ে পথের ধারে—পাকা বেদীর ওপরটা বেশ যত্ন করে প্লাইউডের টুকরো দিয়ে ছাউনী। বাঁশের গায়ে ছোটো বোর্ডে লেখা—'আগামী সংস্কৃতি মঞ্চ'

গত 15 আগস্ট সকাল থেকে এক নতুন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল এখানে—সদ্য-গঠিত 'পিপল্‌স্ সায়েন্স্ এ্যাসোসিয়েশন' শিবির বসিয়েছিলো রক্ত-মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করার। ডাকে সাড়া দিয়েছিলো আশপাশের বহু বস্তি-বাসিন্দা। পরের দিন রবিবার সন্ধ্যায় কয়েকটা স্লাইড সহযোগে 'বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা'র রবীন চক্রবর্তী আর গৌতম ব্যানার্জী মঞ্চে দাঁড়িয়ে শোনালো যথাক্রমে সূর্যগ্রহণ আর জল-দূষণ সম্পর্কে নানা কথা। পরের শনিবার বিকেলে আমি স্লাইড-সহযোগে বললাম বন্যা সম্পর্কে—আর রবিবার পি. এস. এ আবার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা অনুষ্ঠান করলো সকাল বেলা।

পিপল্‌স্ সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন একটা যথার্থ বিজ্ঞান আন্দোলন করার ইচ্ছা নিয়ে মাত্র কিছুদিন আগে তৈরী হয়েছে—সঙ্গে আছে নানা বিষয়ে আগ্রহী ও দক্ষ কিছু তরুণ। এদের সাথে কাজ করার জন্য আমরা (পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা) প্রথম থেকে আগ্রহী—আমাদের সামান্য শক্তি নিয়েই। এই যৌথ উদ্যোগের প্রথম ফসল 'আগামী সংস্কৃতি মঞ্চে' বিজ্ঞান-বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

শ্রোতার অভাব ছিলো না। খেটে-খাওয়া নিম্নবিত্ত বা বস্তি-বাসিন্দা মানুষরা, ছোট-বড়-পুরুষ-নারী তন্ময় হয়ে থেকেছে অনুষ্ঠানে। বুঝুক না বুঝুক, ওরা উৎসাহ জুগিয়েছে আমাদের—কারণ তবু তো আমাদের সংস্থা সাধারণ মানুষের কাছে যেতে পারলো—অন্তত কিছু শোনাতে-দেখাতে।

আসলে ওখানকার মানুষ এই মঞ্চে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুনতে অভ্যস্ত। প্রতি রবিবার আশপাশের বাসিন্দারা পায়ে পায়ে এসে জড়ো হয় ছাউনীর তলায়। পাড়ার ছোটোবড়ো ছেলেমেয়েরা গান করে—মানুষকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাগানোর গান। হয়তো বাইরে থেকে দল আসে গান করতে, নাটক করতে। বিদ্যুতের আলো আর মাইকের ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই। এটা চলছে সেই 1979 সালের নভেম্বর থেকে একটানা। শুধু রবিবার নয়—বিশেষ কোনো দিনে বিশেষ অনুষ্ঠান। তাই এক বছরের পরেই দেখা গেছে প্রায় একশোটা সন্ধ্যা আনন্দে মাতিয়ে রেখেছে এখানকার খেটে খাওয়া মানুষদের।

To obtain

"GREEN TEAK"

Doors and Windows

at half teak-prices

Contact :

ASCU HICKSON LIMITED

7A, Elgin Road,

Calcutta-700020

Phones : 44-0509 / 44-0598

43-3253 / 43-3553

Gram : WOODTREAT

Telex : 021-7938

শুরু হয়েছিলো—কালীপুজোর শ'দুয়েক টাকা বাঁচিয়ে, সবাই হাত লাগিয়ে একটা আসর তৈরী থেকে। গত 1978 সালে মে দিবসে একটা সারারাত গণসংস্কৃতি অনুষ্ঠান করার মধ্যে কয়েক জন স্থায়ী মঞ্চের ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে নেমে পড়লো। শুধু একটি শক্তিশালী বিশ্বাসকে উচ্চারণ করে—"মূল শ্রমজীবী মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সংস্কৃতি আজকে শুকিয়ে যাচ্ছে; তার শেকড়কে আবার মাটিতে বসিয়ে বাঁচাতে হবে।" কোনো নির্দিষ্ট রাজনীতি বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে স্থায়ী সংস্কৃতি মঞ্চ তৈরী হলো, নাম হলো 'আগামী সংস্কৃতি'।

এগিয়ে এসেছে অনেকে। গরীব মানুষদের মধ্যে একটা রুচিবোধ তৈরী হয়েছে ধীরে ধীরে। 'আগামী সংস্কৃতি' এগিয়েছে আরো—1980 সালের নভেম্বর থেকে সাপ্তাহিক আঁকা শেখানোর ক্লাশ; প্রতি শুক্রবার গান শেখানোর ক্লাশ; ঘরের ভেতর আর বাইরে প্রাথমিক চিকিৎসার ক্লাশ (গত দু'মাস ধরে); রবিবার স্থানীয় মানুষদের কিছু চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছেলেরা পিপল্‌স্ হেলথ্ সার্ভিসেস্ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, তারা সামান্য ওষুধেরও ব্যবস্থা করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিরাট জমায়েত হয় ছাউনীর নিচে—তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের কোচিং ক্লাশ বসে। জমে ওঠে সাতজন শিক্ষক আর একশো পাঁচজন ছাত্রছাত্রীর আসর। এরা সবাই বিদ্যালয়ে পড়ে, কিন্তু পড়া দেখিয়ে দেওয়ার কেউ নেই বা শিক্ষক রাখার ক্ষমতা নেই এদের। এ ছাড়া রোজ সকালে বসে ছোটো ছেলেদের ক্লাশ—যে ছেলেরা অনাদরে রাস্তায় শুধু খেলে বেড়াতো তাদের নিয়ে।

আর. জি. কর, চিত্তরঞ্জন আর ডেন্টাল মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা এখানে বসিয়েছে আকুপাংচারের ক্লিনিক। রোগীরা চার আনা পয়সা দিয়ে চিকিৎসা পায়। ঘর ছিলোনা 'আগামী সংস্কৃতি'র তখন। ধীরে ধীরে আজ বড় একটা ঘরে ক্লিনিক জমে উঠেছে। বহু মেহনতী মানুষ টেবিল, খাট, তাক ইত্যাদি তৈরী করে দিয়েছে, ঘরের স্থানটুকুও দিয়েছে এক সুহৃদ।

ছোটোদের নিয়ে কলকাতায় নানা জায়গায় ঘুরতে বেরিয়েছে ওরা—আশি জনের দল নিয়ে। গত জানুয়ারীতে সাতাশ জনের দল নিয়ে বেড়িয়ে এসেছে সুন্দরবনের দ্বারকাপুর। বিড়লা শিল্প ও প্রযুক্তির মিউজিয়াম দেখতে যাবে সেপ্টেম্বরে।

ছেলেমেয়েরা গাছপালা ফুলের জন্ম বৃদ্ধি এখন বোঝে—কারণ নোংরা খালের ধারে মঞ্চের লাগোয়া, ওরা গড়ে তুলেছে একটা বাগান। খোলা জায়গায়—কিন্তু পাড়ার কেউ হাত দেয় না, ফুল ছেঁড়ে না।

'আগামী সংস্কৃতি' অতীতে চেষ্টা করেছে বিজ্ঞানের খবর বা মানসিকতাকে তাদের আশপাশের মানুষের সাংস্কৃতিক বোধের সাথে জড়িয়ে দিতে। নানা কারণে পারে নি। বড় জোর 'মহাকাশ' সম্পর্কে একটা বক্তৃতা। কেউ ধারাবাহিক সম্পর্ক গড়ে মেহনতী মানুষকে বিজ্ঞানের শক্তিশালী হাতিয়ারটুকু তুলে দেয়নি। অথচ বন্ধ্যা জমি পড়ে আছে—'আগামী'-র ডাকে মানুষ আগ্রহ নিয়ে শুনতে আসে, এমন কি বিজ্ঞানের কথাও! উদ্যোক্তারা অধীর আগ্রহে অকুণ্ঠ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা আর পিপল্‌স্ সায়েন্স্ এ্যাসোসিয়েশনকে। যে মানুষরা সারা জীবন আর্থনীতিক শোষণ, সামাজিক নির্যাতন আর ব্যবহারিক কু-সংস্কারে জর্জরিত হয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের কাছে—কিছু একটা আশা নিয়ে—তাদের কাছে গিয়ে বিজ্ঞান গড়ে তোলার সুযোগ আমরা পেয়েছি। ভবিষ্যতে আরো পাবো। সংস্থাকে তাই অনেক, অনেক কাজ করতে হবে।

সৌমেন গুহ

Neo Tele-Tronix Private Limited

Office : 256/8 P. N. Mitra Lane
Calcutta-53

Works : 6/7 Bejoygarh.
JADAVPUR
Calcutta-32 Phone : 72-1133

We manufacture :

HIGH VOLTAGE Transformers including RESIN casted H. V. Transformers,, Breakdown testers such as OIL TESTING SET, Testing sets for Gloves, Bushing, Rubber Mat, Varnish, Cable etc.

HIGH VOLTAGE A.C. & D.C. POWER SUPPLIES for Laboratories, CHOKES,

Different Electronic Control Equipments.

পরিক্রমা

আগে সাঁওতালদি'র অন্ধকার দূর হোক। কয়েকদিন আগে সাঁওতালদি'র সব কটি ইউনিট বন্ধ হ'য়ে ক'লকাতা তথা পশ্চিমবাংলাকে আবার হঠাৎ ডুবিয়ে দিয়েছিল অন্ধকারের অতলে। বেশ কিছুদিন ধরেই সাঁওতালদি'র ব্যাপার-স্যাপার ক্রমশ একটা রহস্যঘন রূপ নিচ্ছে। সরকারী মহল মাঝে মাঝে মাস্‌ল ঝুলিয়ে ব'লছে এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে, কিন্তু কর্মচারীদের প্রতি নিয়মিত বিষোদ্‌গার ছাড়া আর কোন ফল সাধারণ মানুষ দেখছে না। এবারের বিপর্যয়ের জন্য নাকি দায়ী ছিল লঘু ডিজেলের অভাব। এস-ই-বি'র চেয়ারম্যানের বিবৃতি অনুসারে ভিজা কয়লা ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তিনটি ইউনিটকে লঘু ডিজেলের সাহায্যে চালানো হ'চ্ছিল। এই 'ব্যাখ্যা' বিশেষজ্ঞদেরকে সত্যিই বিস্মিত ক'রেছে (স্টেট্‌সম্যান ৭।৯।৮১)। কয়লা ব্যবহার ক'রে কাজ করে যে বয়লার তা'কে ডিজেল চালানো হচ্ছে! এতে জ্বালানী বাবদ বহুগুন বেশী খরচ ত' হচ্ছেই, বয়লারেরও ক্ষতি হচ্ছে প্রচণ্ডরকম। তাছাড়া লঘু ডিজেলেও ত' জল থাকে: ভিজা কয়লা ব্যবহারের অসুবিধা ত' এতেও হওয়ার কথা।

ক'লকাতার তিনটি দৈনিক পত্রিকা থেকে রিপোর্টাররা সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের ব্যাপারে খবর সংগ্রহের জন্য সাঁওতালদি ছুটেছিলেন। তাঁদেরকে পাওয়ার স্টেশনে ঢুকতে দেওয়া হয় নি।

অন্ধকারটা সত্যিই কোথায়?

শিশুহত্যা। দানবীয় আকারের বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বানায় কৌটোয় ভরা কৃত্রিম দুধ। বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো হয় এই দুধ। গত কয়েক বছর ধরে এই দুধের ব্যবহার নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে অভিযোগ আর বিতর্কের ঝড় বইছে। প্রতি বছর দশ লক্ষ শিশু মারা যায় এই দুধ ব্যবহারের দরুন। মৃত্যুর কারণ: অপুষ্টি আর জীবণুর সংক্রমণ। ১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে এক সম্মেলনে দুধ প্রস্তুতকারক শিল্পগোষ্ঠীগুলি এক আচরণবিধি গ্রহণ করে। খারাপ মানের দুধ রপ্তানি, নীতিবহির্ভূত বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির উপর বিধিনিষেধ ছিল এই আচরণ বিধির অঙ্গ। কিন্তু এই আচরণবিধিকে কলা দেখিয়ে চলেছে শিশুঘাতক এই সব কম্পানি। এ বছর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল, মাত্র এই চারমাসের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই আচরণ বিধি ভঙ্গের ১০০০টি নজিরের খবর নথিভুক্ত হয়েছে। (নিউ সায়েন্টিস্ট ৭ই মে, ১৯৮১)।

এদেশের চিকিৎসকদের সাফল্য: বাইরে থেকে রক্ত না দিয়ে ওপ্‌ন হার্ট সার্জারী। ওপ্‌ন হার্ট সার্জারী, অর্থাৎ হৃদযন্ত্রের পেশী, রক্তনালী বা কপাটের (ভাল্‌ভ) উপর অস্ত্রোপচার শল্যচিকিৎসার এক দুরূহ ও জটিল প্রক্রিয়া। তবে বহু দেশেই এখন এই অস্ত্রোপচার করা হয়। এই অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর দেহের রক্ত বাইরে এনে কৃত্রিম ভাবে বিশোধন করে আবার পাম্পের সাহায্যে দেহের ভিতর ফেরৎ পাঠানো হয়। গোড়ার দিকে সব ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়ায় কিছু পরিমাণ বাইরের রক্ত ব্যবহার করা হত। কিন্তু বাইরের রক্ত ব্যবহারে বেশ কয়েকটি অসুবিধা আছে। এতে রোগীর শরীরে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ভারতের মত দেশে, যেখানে রক্ত দেওয়ার লোকের ভীষণ অভাব, সেখানে এই পদ্ধতি সবসময় গ্রহণ করা যায় না। বাইরে থেকে রক্ত না দিয়ে ওপন হার্ট সার্জারীর প্রথম রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল ১৯৬৪ সালে। 'জিহোভাস উইটনেস' নামে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা শরীরে বাইরের রক্ত ঢোকানো পাপ ব'লে মনে করে। তাদের উপরই প্রথম সফলভাবে এই ধরনের অস্ত্রোপচার করা হয়। এদেশে কিন্তু তার পরও দীর্ঘদিন এই অস্ত্রোপচারের কোন সফল নজীর স্থাপিত হয় নি। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৭৬ থেকে '৭৮ সালের মধ্যে বোম্বাইয়ের কে-ই-এম হাসপাতালে ১০০ জন রোগীর উপর সফলভাবে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে কিছু ভারতীয় শল্যচিকিৎসক কৃতিত্বের ভাগীদার হ'য়েছেন (ইণ্ডিয়ান হার্ট জার্নাল, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮১, পৃঃ ৫৯-৬৪)। এঁদের কৃতিত্ব আরো উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে অস্ত্রোপচারের কয়েকটি ধাপে এঁরা এদেশে উদ্ভাবিত যন্ত্র ও পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

তবে চিকিৎসকদের সাফল্য শুধু বড় বড় শহরের বড় বড় হাসপাতালের গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এদেশের কোটি কোটি মানুষ অপেক্ষা করে আছেন সেই সব নর্মান বেথুনদের জন্য যাঁরা এই গণ্ডী ডিঙ্গিয়ে তাঁদের সমস্ত দক্ষতা আর জ্ঞান নিয়ে এসে দাঁড়াবেন শহর-গ্রামের সাধারণ মানুষের মাঝে।

নিউট্রন বোমা বানানোর ভার নিয়েছে কারা ? আমেরিকার তিন বনেদী শিল্পগোষ্ঠীকে বরাত দেওয়া হয়েছে নিউট্রন বোমা বানানোর। এদের মধ্যে প্রথম হল কুখ্যাত রকওয়েল কর্পোরেশন, ডুপণ্ট, মর্গান ও মেলন গোষ্ঠী যার অংশীদার। গত পঞ্চাশ বছর ধরে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগকে এরা যুগিয়ে এসেছে সমরোপকরণ। আর বাকী দুটি হল বেন্‌ডিক্স কর্পোরেশন, ও মানসাটো কম্পানি। চল্লিশের দশকের পারমাণবিক বোমা তৈরীর কর্মকাণ্ডের এরা ছিল অন্যতম অংশীদার। (স্টেটসম্যান, ১২।৮।৮১)

বিহারের খনিপ্রাচুর্যে লুণ্ঠন ও নির্যাতন। ভারতের এক খনিজসম্পদে পরিপূর্ণ এলাকা হলো বিহার রাজ্যের ছোটোনাগপুরের 'কোল্‌হান্' অঞ্চল। 'কোল' বা 'হো' সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ছাড়াও এখানে তাঁতি, নায়াক, গোপে ইত্যাদির বাস। নিদারুণ পশ্চাৎপদ এই অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর খনিজসম্পদ—লোহা, চুনা-পাথর, চীনামাটি, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, কাইনাইট, সিলিকা, এ্যাস্‌-বেস্টস্, কোয়ার্ৎসাইট ইত্যাদি।

এই অঞ্চলে বহু বছর ধরে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খনি—সারদা লাইমস্টোন মাইন, বান্দাকরা কোয়ার্ৎসাইট মাইন, পুৎকাপ্লাই চায়না ক্লে মাইন, ইত্যাদি। আদিবাসীদের অশিক্ষা আর এলাকার অনগ্রসরতাকে পুঁজি করে হাজার হাজার মানুষকে ঠকিয়ে মুনাফা লুণ্ঠন থেকে শুরু করে নারী শ্রমিকদের সম্ভ্রমহানির ঘটনায় এই অঞ্চলের খনি শিল্প কলুষিত। সম্প্রতি চাইবাসার আদিবাসী তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র [Tribal Documentation Centre] এই অঞ্চলে খনি শিল্পের লুণ্ঠন ও নির্যাতনের বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। আমরা এই পত্রিকার পাতায় চেষ্টা করবো কোল্‌হান্ অঞ্চলে খনি-শিল্পের এই তথ্যভিত্তিক রিপোর্টের সম্পর্কে আলোচনা করার।

খনি দুর্ঘটনার সাপ্তাহিক উৎপাদন? গত ২৫ আগস্ট আসানসোলের চিনাকোরি কয়লা খনির ছাদের একাংশ ধ্বসে পড়ে একজন শ্রমিক নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে।

জানুয়ারী থেকে আজ পর্যন্ত এই ক'মাসের মধ্যে তেত্রিশটি মারাত্মক খনি দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে সাঁইত্রিশ জন মানুষের। অর্থাৎ গড়ে প্রতি সপ্তাহে একটিরও বেশী মারাত্মক খনি দুর্ঘটনা !!

[তথ্য : স্টেটস্‌ম্যান্ ২৭।৮।৮১]

'সন্ধানী'

শাঁখ বাজাও রাহু খেদাও

গত একত্রিশে জুলাই হয়ে গেল আর একটি সূর্যগ্রহণ। এবারের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের পথ ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর দিয়ে। ভারতের কেবল উত্তরাঞ্চল থেকে দৃশ্য ছিল আংশিক গ্রহণ। আংশিক বলেই প্রচারমাধ্যমগুলোয় ঢাকঢোলের হাঁকডাক ছিল কম। তা বলে ধর্মভীরু মানুষেরা অসতর্ক ছিলেন না মোটেই। আংশিক হোক—গ্রহণ তো বটে। যথারীতি ঘণ্টা বেজেছে মন্দিরে, শাঁখে ফুঁ দিয়েছেন গৃহস্থ বধুরা, অসংখ্য কলকারখানা নর্দমা নিঃসৃত দূষিত আবর্জনার বাহক গঙ্গার পবিত্র [!] জলে ডুব দিয়ে গাদাগাদা মানুষ গায়ে কাদা মেখে ধুয়ে এসেছেন মনের গ্লানি, গ্রহণশেষে রান্না চড়ায় অফিসযাত্রী বাবুরা অনেকেই হয়েছেন লেট—। অবশেষে স্তিমিত হয়ে এসেছে সব উত্তেজনা।

তবে সাধারণ মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে গত বছরের [ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০] পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কালের ঘটনা এবং গত মার্চ, ১৯৮০ তারিখের 'সায়েন্স টু-ডে' তে প্রকাশিত শ্রীমতি সুমতি সামপেমেনের ছোট্ট একপাতার লেখা **"The eclipse of reason"**য়ে তাঁর চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার বিবরণটি। আংকোলার কাছে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে একটি সাময়িক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ঘটনা। সময় ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ সাল। সারা সকাল ধরে চলল প্রস্তুতি। অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এগিয়ে এল—পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের। নানান জনে নানান পরীক্ষা চালালেন ওই মুহূর্তকটিতে। অবশেষে গ্রহণ কেটে গেল এক সময়। এমন সময় দেখা গেল ত্রিবান্দ্রমের মলায়লম পত্রিকা কলা কৌমুদীর' জনাকয় সাংবাদিক গ্রহণ শেষে শুরু করলেন এক অভিনব পরীক্ষা। গ্রহণ নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করতে এসেছেন তাঁদের ওপরই পরীক্ষা ! খুবই সংক্ষিপ্ত আয়োজন—কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেল গভীর এর তাৎপর্য। গ্রহণ শেষে দেখা গেল ওই সাংবাদিকরা ঘর্মাক্ত ক্লান্ত বিজ্ঞানীদের কাছে গিয়ে এগিয়ে ধরলেন সদ্য প্যাকেট ভাঙ্গা কিছু বিস্কুট—দু'এক পিস্ মুখে দিয়ে একটু শান্ত হয়ে নেবার জন্য। —কিন্তু অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা গেলা এই অপ্রত্যাশিত এবং অযাচিত আপ্যায়নে। উপস্থিত বিজ্ঞানী এবং অপেশাদার জ্যোতিবিদদের প্রায় কেউ এগিয়ে এসে মুখে দিলেন না এক খণ্ড বিস্কুট—যদিও এঁদের অনেকেই কাজের তাড়ায় প্রায় অভুক্ত সারাটাদিন !!

পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল আংকোলার একটি ছোট পাহাড়ের ওপর। শঙ্খধ্বনি দিয়ে শয়তান তাড়াবার মত হয়তো কেউ ছিলনা সেই জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ে। তাই বিজ্ঞানী সত্তার খণ্ডিত কিছু রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল আমাদের কাছে। অবশ্যি আমরা জানতেও পারতাম না—যেমন জানতে পারিনা তথাকথিত বহু পণ্ডিতদের এমন বাঁকাতেড়া মানসিকতার প্রকৃতরূপ—যদি না সুমতি দেবী বা ওই সাংবাদিকদের মত কেউ উপস্থিত না থাকতেন ওইখানে সেইদিন।

রবীন চক্রবর্তী

মাছ খাওয়ার অভ্যাস কি হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায় ?

আজকাল পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ভাবনায় বিজ্ঞানীদের মনে এ ধারণা গড়ে উঠেছে যে শুধু পরিমাণ নয় স্বাস্থ্যরক্ষায় বা সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য খাদ্যের গুণাগুণের দিকে লক্ষ্য রেখে সঠিক খাদ্যাভ্যাসও গড়ে তোলা দরকার। কেবল খাদ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে শরীরে এমন উপাদানের ঘাটতিতে অপুষ্টি-জনিত নানা রোগ হতে পারে। এমনকি আপাতভাবে অপুষ্টিজনিত রোগ হিসাবে পরিচিত নয় এমনক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভ্যাসের সাথে রোগের সম্পর্ক দেখা যায়। ধরা যাক হৃদরোগের কথা। হৃদরোগ অনেক ধরণের হয়। তার মধ্যে থ্রম্বোসিস (**Thrombosis**) ও মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কসান (**Myocardial Infarction**) জাতীয় রোগের সাথে খাদ্যের কিছু উপাদানের সঠিক পরিমাণ পাওয়া যাওয়া বা না যাওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কযুক্ত। থ্রম্বোসিস ও মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কসান আবার শরীরের ভিতরে রক্ত জমাট বাধার প্রবণতার উপর নির্ভর করে কেন না ঐ সমস্ত রোগে শরীরের বা হৃদযন্ত্রের কোন অংশের শিরা উপশিরায় ছোট ছোট জমাট বাধা রক্ত-পিণ্ড আটকে গিয়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে মৃত্যু হতে পারে। এর অর্থ খাদ্য থেকে পাওয়া কয়েকটি উপাদানের সাথে রক্ত জমাট বাধা প্রক্রিয়ার এবং সেই সাথে কয়েক ধরণের হৃদরোগের সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কটি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কয়েক বছর আগে কিছু বিজ্ঞানী এটা লক্ষ্য করেন যে এস্কিমোদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সাধারণ ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানদের চেয়ে কম। সমুদ্রোপকূলবর্তী কয়েকটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যেও হৃদরোগের প্রবণতা কম। পরবর্তীকালের গবেষণায় একটি সুস্পষ্ট সম্পর্কের আভাস পাওয়া গেল যে ঐ সমস্ত মানুষের মাছ খাওয়ার প্রচলিত অভ্যাসের সাথে হৃদরোগের স্বল্পতার সরাসরি যোগাযোগ আছে। সাধারণ ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানরা মাছ খাওয়ার চেয়ে ফার্ম ও পোলট্রিজাত প্রাণীর ডিম, মাংস ও দুধ খেতে বেশী অভ্যস্ত। মাছ খাওয়া—না খাওয়ার সাথে শরীরে যে উপাদানটির পরিমাণের তারতম্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো কয়েক ধরণের ফ্যাটি এসিড। যেমন, লিনলেয়িক এসিড (**LA**), লিনলেনিক এসিড (**LNA**) এবং এইসব ফ্যাটি এসিড থেকে উদ্ভূত-অন্যান্য ফ্যাটি এসিড। মাছ খাওয়ার ফলে এস্কিমোদের দেহে লিনলেনিক জাতীয় ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ বেশী। এর বিপরীতে সাধারণ আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান দেহে লিনলেনিক জাতীয় ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ কম। এখন প্রশ্ন হলো, এই ধরণের ফ্যাটি এসিডের সাথে হৃদ-রোগের কি সম্পর্ক ?

ফ্যাটি এসিড : যে সমস্ত জৈব এসিড কার্বন পরমাণুর দীর্ঘ শৃঙ্খল দ্বারা গঠিত, যার ফলে এরা জলে অদ্রবণীয় কিন্তু ক্লোরফর্ম, ইথার, বেনজিন এই ধরণের দ্রাবকে (**solvent**) দ্রবণীয়, তাদের ফ্যাটি এসিড বলে। ফ্যাটি এসিডের কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের মধ্যে সংপৃক্ত (**saturated**) অথবা অসংপৃক্ত (**unsaturated**) বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে। লিনলেয়িক এসিড (**LA**) ও লিনলেনিক এসিড (**LNA**) দুটিতেই ১৮টি কার্বন পরমাণু আছে কিন্তু **LA** তে ৯ ও১২ নম্বর কার্বন দুটি এবং **LNA**তে ৯, ১২ ও ১৫ নম্বর কার্বন তিনটি অসংপৃক্ত বন্ধনে আবদ্ধ।

আমরা যে সমস্ত তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থ খাদ্যের সাথে আলাদাভাবে মিশিয়ে বা খাদ্যের অংশ হিসাবে খেয়ে থাকি তারই একটি বিশেষ অংশ হলো ফ্যাটি এসিড। আমাদের দেহে শক্তি জোগানোয় এবং দেহকোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ম্যমব্রেন (**Membrane**) গঠনে ফ্যাটি এসিডের ভূমিকা অপরিহার্য। বিভিন্ন ধরণের ফ্যাটি এসিড প্রাণী, উদ্ভিদ বা জীবাণু (**Microbe**) জগতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনেকগুলিই মানুষ বা প্রাণীদেহে তৈরী হতে পারে। কিন্তু কয়েকটি ফ্যাটি এসিড তৈরী হয় না। সেই ফ্যাটি এসিডগুলিকে অবশ্যই বিভিন্ন খাদ্যের মারফত দেহে পৌছুতে হবে নইলে অপুষ্টিজনিত নানা রোগে ভুগতে হবে। এই অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিডগুলির (**Essential Fatty Acids**) কয়েকটির নাম হলো লিনলেয়িক এসিড (**LA**), লিনলেনিক এসিড (**LNA**) ইত্যাদি। স্তন্যপায়ী প্রাণীদেহে **LA**-এর আবশ্যকীয়তা এখন বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত কিন্তু **LNA**-এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনার দাবী রাখে। খাদ্য থেকে পাওয়া **LA** ও **LNA** থেকে প্রাণীদেহে নানারকম বিক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে আরও নতুন নতুন এসিড, যথা এরাকিডনিক এসিড (**AA**), আই কোসাপেন্টানয়িক এসিড (**EPA**), ডোকসাহেক্সানয়িক এসিড (**DHA**) তৈরী হয়। আবার **AA** ও **EPA** থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোষ্টাগ্লানডিন (**PG**) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ প্রাণীদেহেই প্রস্তুত হয়।

বিভিন্ন প্রোষ্টাগ্লানডিন (PG) হরমোনের মত আমাদের স্বাভাবিক

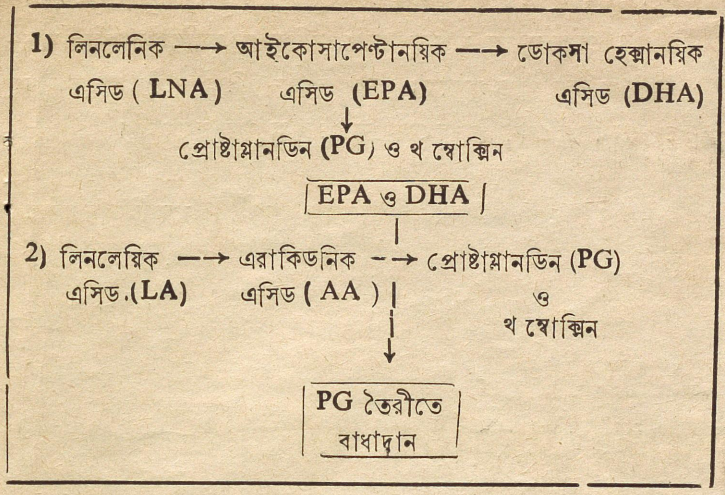

জীবনধারণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে PG-এর সাথে রক্ত জমাট বাধানো প্রক্রিয়ার সম্পর্কটি আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। অনেক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলস্বরূপ শরীরের বাইরে আসা রক্ত জমাট বাধে এবং এরই ফলে শরীরের কাটা অংশে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। যদিও রক্ত জমাট বাধানোর কাজে সাহায্যকারী উপাদানগুলি শরীরের ভিতরেই মজুত থাকে তবু শিরা-ধমনীতে রক্তস্রোত স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হয়। কতকগুলি নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া এই উপাদানগুলির মধ্যে এমনভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে যে কেবলমাত্র কেটে যাওয়া অংশে বা নিঃসারিত রক্তে জমাট বাধানোর প্রক্রিয়া কার্যকরী হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি শরীরের ভিতরেই রক্ত জমাট বাধতে থাকে তাহলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে থ্রম্বোসিস অথবা মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কসান (যে অবস্থায় রক্ত প্রবাহ বন্ধ হওয়ার দরুন হৃদযন্ত্রের কোন কোন অংশের কোষগুলি অকেজো হয়ে যেতে বা মরে যেতে পারে) জাতীয় রোগে আক্রান্ত হতে হবে। PG এবং আরও কয়েকটি পদার্থ একযোগে এই নিয়ন্ত্রণ কাজে অংশগ্রহণ করে দেহের অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাধার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। ঠিক এইখানেই বিভিন্ন ফ্যাটি এসিডের ভূমিকা উল্লেখ করা প্রয়োজন। AA-থেকে তৈরী যে সমস্ত PG রক্ত জমাট বাধানোয় সাহায্য করে EPA ও DHA সেই সব PG তৈরীতে বাধা দেয়। কিন্তু EPA থেকে প্রস্তুত PG গুলি রক্ত জমাট বাধানোয় সাহায্য করে না। আবার EPA ও DHA উদ্ভূত হয় LNA থেকে। অর্থাৎ লিনলেনিক এসিডজাত ফ্যাটি এসিড গুলি (EPA, DHA) রক্ত জমাট বাধানোর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে।

এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয় বা হতে পারে তাকে দুই স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাথমিক স্তরে রক্তের ভারসাম্য জমাট না বাধার দিকে থাকবে। কাজেই হৃদরোগের সম্ভাবনা কমবে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে LNA জাতীয় ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ অনেক বেশী বেড়ে গেলে, রক্ত জমাট বাধার সম্ভাবনা এতো কমে যাবে যে কোন ধরণের রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ করা যাবে না। এই অবস্থা আবার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। কাজেই এখানেও একটি মাত্রা বা ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন আছে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে হৃদরোগ, রক্ত জমাট বাধা কিংবা রক্তক্ষরণের প্রবণতা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি ফ্যাটি এসিড ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের সাথে জড়িত। আমরা শুধু একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

এতক্ষণ ধরে যে কথা বলার চেষ্টা হচ্ছিলো তা হলো এই যে LA-এর সাথে কিছু পরিমাণ LNA আমাদের খাদ্যে থাকা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে রক্ত জমাট-বাধানোর বিষয়টি ছাড়াও খাদ্যে LNA-এর উপস্থিতি মস্তিস্ক এবং চোখের কার্যকারীতার উপর প্রভাবে ফেলে কেননা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে LNA-এর ঘাটতিতে মস্তিস্ক এবং চোখের স্বাভাবিক কার্যকারীতা হ্রাস পায়। এখন প্রশ্ন হলো, উপযুক্ত পরিমাণ LNA কোথা থেকে পাবো ?

এবার আবার খাদ্যাভ্যাসের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমাদের সাধারণ খাদ্যতালিকার মধ্যে কিছু কিছু ভোজ্যতেলে সামান্য কিছু LNA পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে তেলের ব্যবহার বিভিন্ন। ফলে সব অঞ্চলের খাদ্য-তালিকায় LNA পাওয়া যেতে পারে এমন উৎস নাও থাকতে পারে। তাছাড়া শুধু তেলের উপর এই ফ্যাটি এসিডের জন্য নির্ভর করা ঠিক নয়। এই তেলগুলির গুণাগুণ বা উপকারীতা সম্পর্কে বির্তক রয়েছে। বেশী পরিমাণে ভোজ্যতেল খাওয়া অনুচিত। পক্ষান্তরে প্রোটিন, LA ও LNA-এর উৎস হিসাবে মাছ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা অনেক বেশী কার্যকরী। এর মধ্যে আবার মিঠেজলের মাছ ও সামুদ্রিক মাছের মধ্যে একটু তফাত আছে। LNA, EPA ও DHA এর পরিমাণ মিঠেজলের মাছ থেকে সামুদ্রিক মাছে কিছু বেশী। সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাসের দরুনই এস্কিমোদের মধ্যে হৃদরোগের ঘটনা কম দেখা যায়।

এখানে ভারতের অবস্থা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু হৃদরোগের প্রবণতার সাথে খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক নিয়ে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য করা যায় ভারতবাসীদের নিয়ে এমন তথ্য খুব কম পাওয়া যায়। তাই আমাদের এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাছ খাওয়ার অভ্যাস কম। দক্ষিণাঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাস কিছুটা চালু আছে। পূর্বাঞ্চলে মিঠেজলের মাছের কদর সবচেয়ে বেশী। সামুদ্রিক ও মিঠেজলের মাছে ফ্যাটি এসিডের তারতম্যের কথা মনে রেখে সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। যে

সব অঞ্চলে মাছ খাওয়ার প্রচলন নেই সেখানে অবশ্যই মাছকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। এরজন্য দরকার জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা এবং বাজারে মাছের যোগান বাড়ানো।

পশ্চিমবঙ্গে সামুদ্রিক মাছের চাষ এবং সমুদ্র থেকে ধরা মাছের পরিমাণ খুব কম। এ ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়ে থাকে তা নামমাত্র। অথচ বঙ্গোপসাগর উপকূলভাগ মৎস উৎপাদনের এক বিশাল উৎস। এই উৎসকে কাজে লাগিয়ে বাজারে মাছের যোগান বাড়ালে তা একদিকে যেমন মাছের দাম কমাবে তেমনি আর একদিকে সামুদ্রিক মাছ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে। আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার সাথে এর যোগাযোগ বিশেষ কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

গৌতম ব্যানার্জী। বসু বিজ্ঞান মন্দির

রিপোর্ট

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাম্প্রতিক আন্দোলন

গত ৭ই আগস্ট ১৯৮১ তারিখে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা কয়েকটি জরুরী দাবী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সভা চলাকালীন তাঁদের বক্তব্য ঐ সভায় পেশ করতে যান। এঁদের দাবী-গুলি ছিলো মোটামুটি নিম্নরূপ।

১। লোড-শেডিং-এর জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরীতে রিসার্চের কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কলকাতায় প্রায় সব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে লোডশেডিং-এর বাইরে রাখার বন্দোবস্ত হয়েছে। অনুরূপ কোন ব্যবস্থা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়েও করতে হবে।

২। থিসিস জমা দেওয়ার পর ডিগ্রী পেতে এক বৎসরের উপর সময় লেগে যায়। এই সময় কমিয়ে ৩।৪ মাসের মধ্যে ডিগ্রী পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। UGC-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ধিত হারে স্কলারশীপ ১৯৮০-এর অক্টোবর থেকে দিতে হবে। বর্তমানে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ থেকে ঐ হারে স্কলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রথমে এঁদের কোন বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরে সভা যখন প্রায় শেষ তখন তাঁদের ডাকা হয়। এতে গবেষকরা ক্ষুব্ধ হন কেননা তাঁরা মনে করেন যে সভার শেষের দিকে তাঁদের বক্তব্য বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ থাকবে না। গবেষকরা তাঁদের অনেক পুরনো অথচ জরুরী বিষয়গুলি সম্পর্কে ঐ সভাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভাইস চ্যান্সেলারের কাছে দাবী জানাতে থাকেন এবং বলেন যে কোন সিদ্ধান্ত না নিলে তাঁরা স্থানত্যাগ করবেন না। কার্যকরী সমিতির সভ্যরা তখন থানার সাহায্য নিতে কোন দ্বিধা না করে পুলিশ ডেকে পাঠান। পুলিশ ডাকার ব্যাপারটি ছাত্র শিক্ষক সবাই-এর দ্বারা নিন্দিত হয় এবং গবেষকদের সমর্থনে একদিনের ধর্মঘট পালিত হয়।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে গবেষকদের মধ্যে তাঁদের সঠিক দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধতা বেড়েছে এবং গবেষকদের সংগঠন একটি শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি একটি উলেখযোগ্য ঘটনা কেননা গবেষকরা প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হন এবং তার ফলে তাঁদের ন্যায্য সমস্যাগুলি কারও নজরে পড়ে না। ঐ সংঘবদ্ধতার দরুণই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর গবেষকদের সাথে পরে আবার আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। তিনি তাঁদের সমস্যা-গুলি সমাধানে সহযোগিতা করার ও দ্রুত লিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দেন এবং তৃতীয় দাবীটি মেনে নেন।

আলোচনা সভা। জয়পুরের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরীর কেন্দ্র

গত ১১ই জুলাই, ১৯৮১ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেডিকাল কলেজ ছাত্র সংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল বক্তব্য পেশ করেন সাংবাদিক শ্রীসঞ্জয় মিত্র। জয়পুরের কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরীর কেন্দ্রটি সম্পর্কে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ রিপোর্ট রাখেন। বিদেশী মডেলের বিপরীতে সহজ দেশী কারিগরির উপর ভিত্তি করে দেশীয় প্রয়োজনভিত্তিক প্রচেষ্টার এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীমিত্র প্রতিবন্ধদের সমস্যার সামাজিক মূলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বেশ কিছু স্লাইড সহযোগে তিনি তাঁর বক্তব্যকে বেশ আকর্ষণীয় ভাবে পেশ করেন। এরপর তিনি শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।